৪১বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আহরণ	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস	২
কাণ্ডজ্ঞান	আশীষ লাহিড়ী	৪
করোনা	সিদ্ধার্থ জোয়ারদার	৭
আর্য রহস্য	অঞ্জনকুমার সেনশর্মা	১০
সামাজিক মাধ্যম	সৌরভকুমার মোদক	১৩
জলঙ্গী নদী	অলোককুমার বিশ্বাস	১৭
স্মরজিৎ জানা		২০
ব্রজ রায়		২১
অমিত চৌধুরী		২২
সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী		২৩
স্বচিকিৎসা	গৌতম মিস্ত্রি	২৪
বিস্মৃতির আড়ালে	সবর্ণা চট্টোপাধ্যায়	২৭
আকাশের কথা	দীপঙ্কর দে	৩০

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট : www.utsomanush.com/ই - মেল: utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক: http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

আমাদের কথা

প্রায় দেড়বছর হতে চলল, অতিমারীতে মানুষ দিশেহারা, ভীত, আতঙ্কিত, পর্যুদস্ত। চেনা পরিচিত আত্মীয় বন্ধু হারিয়েছেন অনেকেই। বাবা মা হারিয়ে এই নির্দয় নিষ্ঠুর সামাজিক আবহে আশ্রয়হীন অভিভাবকহীন একাকী অসহায় শিশু। ইস্কুল, কলেজ বন্ধ, পরীক্ষা বাতিল। ঘরবন্দি পড়ুয়ারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। যার প্রভাব আগামী দিনে সমাজের ওপর পড়বেই। চিকিৎসা পরিষেবা চালু রাখতে গিয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারলেন না বেশ কিছু ডাক্তার। সংখ্যাটা প্রায় ১৫০০ ছাড়িয়ে গেছে। কতজন নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী মারা গেছেন তা জানা যায় নি। চিকিৎসা পরিষেবার অভূতপূর্ব এই সঙ্কটে এক অপূরণীয় ক্ষতি। এইসব সমাজবন্ধুদেরও পাড়া ছাড়া করার হুমকি দেওয়া ও নানানভাবে হেনস্থা করা হয়েছিল। প্রয়াত সেইসব ডাক্তার নার্স অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

পরিবেশ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় সুন্দরলাল বহুগুণা, উৎস মানুষ প্রাক্তনী ডাক্তার স্মরজিৎ জানা, দেহদান ও অঙ্গদান আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্রজ রায়, লেখক অনীশ দেব, অমিত চৌধুরী কোভিডে প্রয়াত হলেন। এছাড়াও আমরা হারিয়েছি গণবিজ্ঞান আন্দোলনের নিরলস কর্মী বিজয় সরকার, গৌতম সেন, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী সুদীপ্ত সেনকে। দুরারোগ্য রোগে প্রয়াত হলেন আমাদের খুব কাছের মানুষ সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী। এইসব সংস্কৃতিমান মানুষের প্রয়াণে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল। বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে এঁদের অবদান ভোলা যাবে না। প্রয়াতদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, পল পোগবা ও ম্যানুয়েল লোকেতেল্লি ইউরো ২০২০ চলাকালীন এক কাণ্ড করে বসলেন। খেলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি রোনাল্ডো। টেবিলে রাখা কোকাকোলার দুটি বোতল সরিয়ে হাতে তুলে নিলেন জলের বোতল। একই কাজ করলেন পোগবা। পরদিনই প্রতিযোগিতার অন্যতম স্পন্সর কোকাকোলার দাম শেয়ার বাজারে এক ঝটকায় বেশ খানিকটা পড়ে গেল। আরেক স্পন্সর হাইনেকেন বিয়ার কোম্পানি। লোকেতেল্লি হাইনেকেন বিয়ারের বোতল সরিয়ে তুলে নিলেন জলের বোতল। শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক যেসব খাবার (?) ও পানীয়-র বিজ্ঞাপনে নামীদামী তারকাদের দিয়ে চোখ ধাঁধানো মিথ্যে প্রচার চলে তা বেশ জোর ধাক্কা খেল। আমাদের দেশের তারকা খেলোয়াড় ও গ্ল্যামারাস অভিনেতা যাদের বিজ্ঞাপনের মোহে মানুষ ভোলে তারা রোনাল্ডো, পোগবাদের থেকে যদি একটু শিক্ষা নিতেন তো সমাজ লাভবান হত।

ধর্মান্ধরা বিজ্ঞানকে কোন রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ দেখা গেল প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানে। সে দেশে বর্তমান শাসকদল সিঙ্গল ন্যাশনাল কারিকুলাম কমিটির তৈরি করা এক দেশ এক সিলেবাস চালু করতে চলেছে। ঐ আমাদের মতো 'এক দেশ, এক সিলেবাস' আর কি। যার শুরু হয়েছে খোদ ইসলামাবাদের ইস্কুলগুলোতে। পাঠ্য বইতে, যার ভেতর বিজ্ঞানের বইও রয়েছে, কোন বিষয় থাকবে আর কোন বিষয় বাদ যাবে তা ঠিক করবে মৌলবীরা। তাদের কড়া নির্দেশ বায়োলজি বইতে মানুষের শরীরের ডায়াগ্রাম বা ছবি থাকতে পারে তবে তা যেন বিনা পোশাকে না থাকে। আল্ট্রাসোনোগ্রফিতে শরীরে বে-আব্রু ছবি ওঠে তাই তাতেও আপত্তি। কারণ বে-আব্রু শরীর দেখানো 'শরম কি বাত'। পাঞ্জাব ও সিন্ধ প্রদেশ স্কুল বোর্ড বায়োলজি বইতে খরগোশের ডায়াগ্রাম দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেখানেও ঢাকাঢুকি দিয়েই বই ছেপেছে। আমরা কী সে পথেই হাঁটছি? কামধেনু, গোমূত্র ও গোময় নিয়ে গবেষণায় উৎসাহ দিয়ে, গণিত ও পদার্থবিদ্যা না জেনেও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যাবে এমনই একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে।

২৪ জুন ২০২১ ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটিতে স্নাতকোত্তর স্তরে জ্যোতিষ পাঠক্রম চালু হয়েছে। দেশের বিজ্ঞানীরা যার প্রতিবাদ করেছেন। এর শেষ কোথায় জানা নেই।

২০২০-র থেকে আজ পর্যন্ত অনেক ছোট পত্রিকা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে নয়ত কোনমতে টিঁকে রয়েছে। আমরা পত্রিকা বের করতে পারছি তবে পত্রিকা পাঠকের হাতে তুলে দেন যাঁরা সেই হকার বন্ধুরা পেশা চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। বিক্রি কমেছে। গত সংখ্যার পত্রিকা ডাকযোগে গ্রাহকদের পাঠানো হয়েছিল। অনেকেই পাননি বলে জানালেন। ডাক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এছাড়া আমাদের বিশেষ কিছু করণীয় নেই। কোনো কোনো গ্রাহককে তাঁদের বিশেষ অনুরোধে স্পিড পোস্টে পত্রিকা পাঠানো হয়েছে। ডাক খরচ তাঁরাই দিয়েছেন। তাও বেশ দেরিতে পৌঁছেছে। — **সম্পাদকমণ্ডলী**

উমা

আহরণ

পুরুষকার এবং অদৃষ্ট

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

[জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস একটি কাজের জন্যই অমর হয়ে থাকতে পারতেন, সেটি ২০-২৫ বছরের একক প্রচেষ্টায় সওয়া-লাখ শব্দ-সমন্বিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' সঙ্কলন। তার বাইরেও তিনি 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী'-র মতো নজিরবিহীন গ্রন্থের পাশাপাশি লিখেছিলেন 'প্রাণীদের অন্তরের কথা', ইহুদি ধর্মের ইতিহাস, ইব্রীয় ধর্ম, 'শিক্ষা ও সুনীতি', 'চরিত্রগঠন' 'ঋদ্ধি' ইত্যাদি একাধিক বই। আমাদের আহরিত এই 'পুরুষকার এবং অদৃষ্ট' রচনাটি ওঁর 'ঋদ্ধি' বইটির প্রথম অধ্যায়ভুক্ত। বইটির প্রথম প্রকাশ ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১৫। ইংরেজি ১৯০৮। একশো বছরের আগের এই লেখাটি আজও সমান প্রাসঙ্গিক। লেখকের ভাবনা আর যুক্তিনিষ্ঠতাকে আমাদের কুর্নিশ।]

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।''
"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ।'' —*সদ্ভাবশতক।*

পুরুষকার, উন্নতি ও ঋদ্ধির মূলে অবস্থান করে। চেষ্টা, উদ্যোগ এবং অধ্যবসায় ব্যতীত লোকে লক্ষ্মীলাভ করিতে পারে না। জগতের শ্রীমন্ত জাতি সকলের মধ্যে যাঁহারা প্রধান এবং জ্ঞান, ধন ও ক্ষমতায় যাঁহারা শ্রেষ্ঠ আসন অধিকারের দাবী রাখেন, তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাস পুরুষকারের দৃষ্টান্ত।

য়ুরোপ এক সময়ে অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন ছিল। রীতিনীতি আচার পদ্ধতি এবং কুসংস্কার তথাকার অধিবাসিগণকে মনুষ্যোচিত গুণাবলী হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু এক শুভক্ষণে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া তথায় জ্ঞানের আলোক যখন প্রবেশ করিল, তখন সহসা তাহাদের হৃদয়ের আঁধার ঘুচিয়া গেল, তাহাদের মাথা খুলিয়া গেল; তখন কেহ দর্শনে, কেহ বিজ্ঞানে, কেহ শিল্পে, কেহ সাহিত্যে, কেহ ধর্মে এবং কেহবা সমাজে নিজ নিজ শক্তি অনুসারে উন্নতিবিধানে ব্রতী হইল। কিছুকাল পরে দেখা গেল যথায় মূর্খতা রাজ্য করিতেছিল, তথায় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল; যথায় দুর্গম বনভূমি ছিল, তথায় রাজবর্ত্ম, অট্টালিকা, মনোহর উদ্যান প্রভৃতি শোভা পাইতে লাগিল; যথায় অরাজকতা বিরাজমান ছিল, তথায় সুবিচার ও সুশাসনের প্রতিষ্ঠা হইল; যাহার কূপমণ্ডুক প্রকৃতি ছিল, তাহারা বাণিজ্য-ব্যপারে ব্যাপৃত হইল; যাহারা সামান্য অশনবসনের জন্য লালায়িত ছিল, তাহাদের জন্মভূমি জগতের বিবিধ পণ্যে, ধনধান্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হইল। পশ্চিম ভূখণ্ডের অধিবাসিগণ একদিন প্রাচ্যের ঐশ্বর্য দেখিয়া বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন

করিয়াছিলেন —''কেন এমন হইল?'' তখন এই প্রশ্নের উত্তর দৈববাণীস্বরূপ ভারতের ধনবিজ্ঞান মন্থন করিয়া উত্থিত হইয়াছিল ''উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ''।

পুণ্যভূমির অধিবাসিগণ যে মন্ত্র সাধনদ্বারা জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া মহালক্ষ্মী এবং অমৃতের অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রের সাধক আজি কোথায়! হায়! অমৃতের পুত্রগণ আজি তোমরা সেই সঞ্জীবন মন্ত্র হারাইয়া মহালক্ষ্মীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছ! এক্ষণে ''উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ'' এই মহামন্ত্রের সাধন কর এবং পুনরায় কমলার কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হও।

উদ্যোগ যেরূপ আলস্যের বিপরীত অদৃষ্ট তদ্রূপ পুরুষকারের বিপরীত। সাধারণতঃ লোক যে অর্থে ''অদৃষ্ট'', ''দৈব'', ''ভাগ্য'', ''কপাল'' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা উদ্যম, অধ্যবসায় এবং চেষ্টার বিপরীত। প্রায়ই শুনা যায়— ''কপালে থাকে হবে'', ''কপালে ছিল না হ'ল না'', ''কপালে নাই হইতেছে না''; ''চেষ্টা ক'রে আর হবে কি? কপালে যখন নাই, তখন হাজার চেষ্টা করিলেও কিছু হবে না।'' ''অমুকের কপাল মন্দ ওর দোষ কি?'' ''কপালে বা অদৃষ্টে থাকে তুমি নিশ্চয়ই পাইবে।'' ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ''কপাল'' বা ''অদৃষ্ট'' বা ''ভাগ্য'' — পুরুষকার, চেষ্টা, উদ্যম, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, উৎসাহ প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণরাশির মূলে অহরহঃ কুঠারাঘাত করিতেছে। দুই এক বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়া অনেক উচ্চাভিলাষী যুবক, অবসাদের জনক কপাল বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিরস্ত হন। যাঁহারা 'কপাল', 'অদৃষ্ট' এবং ''ভাগ্য ফলতি সর্বত্র'' বলিয়া অহরহঃ চীৎকার করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের হৃদয়ে উচ্চাভিলাষের অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে। কেন এমন হইল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাঁহাদের এই চীৎকারের মূলে আলস্য অযোগ্যতা এবং ভগ্নস্বাস্থ্য বা অন্য কোন ত্রুটি বিদ্যমান আছে। কিন্তু আত্মপ্রতারণাপটু বৃথাগর্বী ব্যক্তিগণ আত্মত্রুটি ও অযোগ্যতা গোপন করিবার জন্য, আপনার এবং অন্যের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিবার সরল পন্থা অবলম্বন করেন; তাঁহারা বলেন, অদৃষ্টের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য! ''অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডিবে বল?'' ইত্যাদি। এই যে অনেক যোগ্যব্যক্তি চাকরিস্থলে অল্প বেতনে বহুকাল পড়িয়া থাকেন তাহার কারণ কি? কর্মক্ষম ব্যক্তিগণ গুণের পুরস্কার না পাইয়া এবং তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখিতে দেখিতে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন— ''তাঁহাদের— অদৃষ্টই মন্দ।'' কিন্তু তাঁহারা একমুহূর্তের জন্যও ভাবেন না যে, যে সকল অযোগ্য ব্যক্তি, স্বল্পশিক্ষা, হীনশক্তি এবং দুর্বল মস্তিষ্ক লইয়া উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া চলিয়াছেন তাঁহারা— স্ব স্ব অদৃষ্ট বা ''কপাল'' ক্রয় করিয়া থাকেন। তাঁহারা শিক্ষা, কার্যকুশলতা এবং হৃদয়ের সদ্ভাব সমূহে হীন হইলেও, যে সকল কৌশলে তাঁহাদের ভাগ্যবিধাতৃগণ সন্তুষ্ট এবং বাধ্য হন, সেই সকল উপায় এবং কৌশল প্রয়োগে তাঁহারা নিপুণ। এই সকল ব্যক্তি কখন নিশ্চেষ্ট থাকেন না; ইঁহারা অদৃষ্টবাদী সহযোগিগণের ঔদাসীন্যের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং বিবিধ কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। এই চেষ্টা, এই উদ্যোগ, এই একাগ্রতার কি কোনই পুরস্কার নাই? এই সকল বলবত্তার গুণ তাঁহাদের অন্য সমুদয় অযোগ্যতাকে আবৃত করিয়া রাখে। পক্ষান্তরে ঔদাসীন্য এবং নিশ্চেষ্টতা যোগ্যতর ব্যক্তিদিগের গুণরাশিনাশী হইয়া আর্থিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে; সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সদুপায়েই হউক আর অসদুপায়েই হউক চেষ্টা বা পুরুষকার ব্যতীত কার্যসিদ্ধি হয় না। যাঁহাদের ''কপাল'' বা অদৃষ্ট প্রসন্ন তাঁহারা স্ব স্ব অদৃষ্ট পুরুষকার দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন। ''সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ আসিয়া কখন প্রবেশ করে না।'' আলোক যেমন ছায়ার নিত্যসঙ্গী, এ জগতে সেইরূপ, সকল বিষয় ও বস্তুর সহিত ভাল এবং মন্দ জড়িত আছে। অদৃষ্টবাদ যেমন জাতীয় অবসাদ, নিশ্চেষ্টতা এবং অনুন্নতির সৃষ্টি করিয়াছে, অদৃষ্ট তেমনি অলসদিগের এবং যাহারা উদ্যম ও চেষ্টা করিয়াও কোন অলক্ষিত কারণে বা অজ্ঞানবশতঃ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না, তাহাদের শান্তির কারণ হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে অদৃষ্টবাদ শান্তি এবং সহিষ্ণুতার জনক। কিন্তু বদ্ধ জলাশয়ের জল যেমন ক্রমেই দূষিত এবং অহিতকর হয়, স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় জাতির পক্ষে অদৃষ্টবাদ তেমনি পরম অহিতকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জগতের শ্রীমন্ত জাতিসকল, অদৃষ্টকে বিনাশ করিয়া পুরুষকারের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন! ঘোর অদৃষ্টবাদিগণ তাঁহাদের অনুগ্রহ ছায়াতলে আশ্রয় লইতেছেন। তাঁহাদের দুঃখ দারিদ্র্য আর ঘুচিতেছে না। এদেশে অদৃষ্টবাদিগণ, অদৃষ্টগণকগণ ভবিষ্যৎ গণনা ও অদৃষ্টের ফলাফল গণনা করিতেছেন, আর উদ্যোগী পুরুষগণ লক্ষ্মীলাভ করিতেছেন। এডবার্ড ডেনিসন তাই বলিয়াছেন, ''ভবিষ্যৎ জানায় গুণপনা নাই কিন্তু তজ্জন্য প্রস্তুত হওয়াই মহাধর্ম।''

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে অনেক উদ্যমশীল যুবকও দুই তিনবার অকৃতকার্য হইয়াই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিরস্ত হন। কিন্তু, যাঁহারা অদৃষ্টের উপর বড় আস্থা স্থাপন করেন না তাঁহারা সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন। যাঁহাদের এরূপ একাগ্রতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, তাঁহারা একবার নহে, দুইবার নহে, শতবার

চেষ্টা করিয়া তবে কৃতকার্য হন। পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য হইয়াও মৃৎবাসন-নির্মাতা প্যালিসি ১৬ বৎসর কাল সাহসে বুক বাঁধিয়া আপনার ব্যবসায়ে দৃঢ় থাকিয়া তবে সিদ্ধিলাভ করেন। যে সহজেই ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়ে তাহার দ্বারা কখন কোন কাজ হয় না। পৌনঃপুনিক অসিদ্ধি জ্ঞানীজনের পক্ষে অকৃতকার্যতাকে অসম্ভব করিয়া তুলে, কারণ প্রত্যেক অসিদ্ধি এক একটি পরীক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে, পুনঃপুনঃ পরীক্ষাজনিত ভূয়োদর্শন ভুলভ্রান্তি দূর করিয়া সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। খাঁটুরিয়া নিবাসী ঁহরিশ্চন্দ্র দত্ত একজন শ্রীমন্ত পুরুষ ছিলেন। ইনি গ্রাম্য পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়া ১০ বৎসর বয়সে গোবরডাঙ্গায় পিতার বাণিজ্যকুঠিতে কর্মশিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। তিনি পাঁচ বৎসর শিক্ষানবিশী করিয়া ১৬ বৎসর বয়সে স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং কর্মকুশলতা প্রদর্শন করিয়া পিতার বিশ্বাসভাজন ও তাঁহার সমুদয় কার্যভাব প্রাপ্ত হন। তিনি ১২ বৎসরে দুই লক্ষ টাকা লাভ দেখান। একবার পশ্চিম হইতে ৬০ হাজার টাকার পণ্য নৌকা করিয়া আনিতেছিলেন এমন সময় নৌকা জলমগ্ন হইয়া ৬০ হাজার টাকা নষ্ট হয়। এদিকে তিন চার বৎসরের মধ্যে মাতৃবিয়োগ, ভ্রাতৃবিয়োগ, জমিদারি বিক্রয় এবং জমিদারি লইয়া দীর্ঘকাল মকদ্দমা, পিতামাতার শ্রাদ্ধের ব্যয়, পুত্র কন্যার বিবাহ প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিয়া তিনি কপর্দকশূন্য হইয়া পড়েন। এ অবস্থায় অনেকেই, বিশেষতঃ অদৃষ্টবাদীরা, ভগ্নহৃদয় হইয়া জীবনে আর পুনরুত্থানে সমর্থ হন না; কিন্তু, উদ্যমশীল এবং অধ্যবসায়ী হরিশ্চন্দ্র পুনরায় লক্ষ্মীর কৃপালাভ করিয়া ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের কৃতকার্যতা, মধ্যজীবনের অমিতব্যয়িতা জনিত দারিদ্র্য এবং শেষ জীবনের উদ্যোগজনিত লক্ষ্মীলাভ— তাঁহার স্বকৃত কর্মের ফল, তাঁহার অদৃষ্টের পরিণাম নহে। **উমা**

কাণ্ডজ্ঞান ১৪

আমারেও করো মার্জনা

আশীষ লাহিড়ী

বিরানব্বই বছর বয়সে গত ১৮ জুন মারা গেলেন দৌড়বীর মিলখা সিং।

বয়স যাদের সত্তর পেরিয়েছে তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ছোটোবেলায় মিলখা সিং-কে ঘিরে উত্তেজনা আর আশাভঙ্গের কথা! এশিয়ান গেমসে একের পর এক সোনার পদক জিতে সেটাকে একটা অভ্যেসে পরিণত করেছিলেন তিনি। বাকি ছিল শুধু অলিম্পিকের সোনা। ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকে তাঁর সোনার পদক পাওয়া নিশ্চিত ছিল। আমাদের কত যে স্বপ্ন সেই হলে-হতে-পারত সবেধন নীলমণিটিকে নিয়ে! শুধু আমাদের নয়, বড়োদেরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলখা রোমে সোনা পেলেন না। রূপোও পেলেন না। এমনকী ব্রোঞ্জও না, হলেন চতুর্থ। গোটা ভারতবাসীর মুখে সে যেন একটা চপেটাঘাত। সবাই মুহ্যমান।

তারপরই শুরু হল কাটাছেঁড়া। কেন এমন একটা সুনিশ্চিত পদক হারাল ভারত? জানা গেল, সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য তিনি ব্রোঞ্জ পাননি। কাগজে কাগজে ছবি বেরোল সেই ফটো-ফিনিশের। কিন্তু যারা সোনার তারে সুর বেঁধেছিল তাদের কাছে সেটা কি কোনো সান্ত্বনা!

তারপর কিছুদিনের মধ্যে মিলখা সিং নামের জেল্লা কমে গেল। এমনকী শুরু হল ঠাট্টা বিদ্রূপ। তিনি যে ইংরেজি বলতে পারেন না, এটা বাঙালিদের কাছে একটা ভারি মজার বিষয় হয়ে উঠল। ইংরেজি জানা বা না-জানার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতার কী সম্বন্ধ, সে প্রশ্ন উঠল না। তারও পর, ইংরেজিয়ানার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তখনকার বাঙালি ভদ্রলোকদের মধ্যে চালু হল একটা অশ্লীল রসিকতা। জাহাজের রেলিঙে হেলান দিয়ে মিলখা নাকি উদাস নয়নে সমুদ্রের শোভা দেখছিলেন, এমন সময় একজন সাহেব তাঁকে চিনতে পেরে শুধালেন, 'রিল্যাক্সিং?' উত্তরে মিলখা নাকি বলেন, 'নো স্যার, মিলখা সিং।' হেসে লুটিয়ে পড়তাম আমরা। উনি তো শিখ, আর কে না জানে, শিখরা আমাদের মতো ইংরেজি জানে না!

মনে রাখতে হবে, এ হচ্ছে সেই জমানার কথা, যখন বামফ্রন্ট সরকারের অক্ষয় কৃতিত্বে বাংলা ইস্কুলে ইংরেজি ব্রাত্য হয়ে যায়নি। যখন আমরা বাংলা, ইংরেজি আর সংস্কৃত তিনটে ভাষাই শিখতুম। আর, মাত্র তেরো বছর আগে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি-পাওয়া আমাদের গুরুজনেরা কেবলি বলতেন, সারা ভারতের মধ্যে বাঙালিরা সবচেয়ে ভালো ইংরেজি জানে। আমরাও সেইসব গল্পকথা বিশ্বাস

করতাম। তাই দৌড়বীর মিলখা সিং ইংরেজিতে ঠিক কতটা দড় সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা না-থাকা সত্ত্বেও আমরা বাঙালিরা মেকি আত্ম-গর্বে ডগোমগো ছিলাম।

শোধ নেওয়ার কতকগুলো বিচিত্র পদ্ধতি আছে ইতিহাসের। আজ যখন বাংলার বাইরের লোকদের কাছ থেকে কেবলই শুনি, বাঙালিদের সবই তো ভালো, কিন্তু ওরা ইংরেজিটা একেবারেই জানে না; তখন অবিশ্বাস্য মনে হয়। আর একই সঙ্গে একথাও মনে হয়, এটাই বোধহয় ইতিহাসের চিত্রগুপ্তের বিধান। বামফ্রন্টের পিঠে চেপে তিনিই দিয়েছেন পাশা উলটে।

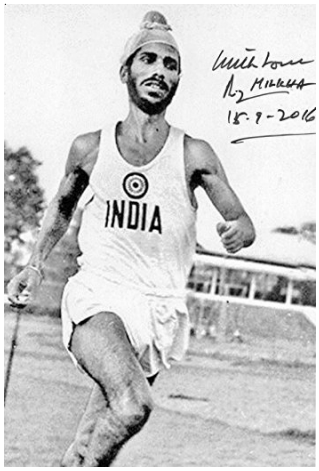

কিন্তু এটা আমার মূল বক্তব্য নয়। সেদিন হঠাৎই এটা-সেটা ব্রাউস করতে করতে দেখলাম চার বছর আগের একটা সাক্ষাৎকার: মিলখা সিং এবং তাঁর গলফ-খেলোয়াড় পুত্র জীব মিলখা সিং-এর সঙ্গে বেশ অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন প্রখ্যাত সাক্ষাৎকারী করণ থাপার। উপলক্ষ মিলখার ইংরেজি আত্মজীবনী *দ্য ফ্লাইং শিখ* এবং তারই ওপর আধারিত 'ভাগ মিলখা ভাগ' চলচ্চিত্র। থাপার প্রশ্ন করলেন ইংরেজিতে, মিলখা উত্তর দিলেন পাঞ্জাবি অ্যাকসেন্টের হিন্দিতে, মাঝে মাঝে ইংরেজিতে।

সেই সাক্ষাৎকারটি থেকে যা জানলাম তাতে বাঙালি হিসেবে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল; ভারতবাসী হিসেবে মাথা উঁচু হল। অবিভক্ত ভারতের পাঞ্জাবের গোবিন্দপুরা নামে এক অজ পাড়াগাঁয়ে ১৯২৯ সালে হতদরিদ্র এক চাষার ঘরে জন্ম মিলখার। অনেক ভাইবোনের সংসার। অনেকে অকালমৃত। বৃদ্ধ মিলখা জানালেন, সেটা এমনই গণ্ডগ্রাম যে তাঁর দাদা মাখন সিং যখন দিনের পর দিন দুটো খাল পেরিয়ে, খালি পায়ে রৌদ্রতপ্ত কঠিন মাটির ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে ইস্কুল গিয়ে, একদিন ম্যাট্রিক পাশ করলেন, সেদিন দলে দলে লোক ভেঙে পড়েছিল দাদাকে দেখতে। লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দাদাকে দিয়ে চিঠি পড়িয়ে এবং লিখিয়ে নেবে বলে। তারই মধ্যে মিলখার বাবা সম্পূরম সিংয়ের পণ ছিল, যেকরেই হোক, ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে হবে, এই দুঃসহ দারিদ্র্যের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে।

দেশভাগের সময় পাঞ্জাবে বীভৎস দাঙ্গা হয়েছিল, আমরা বইতে পড়েছি। ১৯৪৭ সালে আঠারো বছরের মিলখা সে-দাঙ্গা স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি সজল চোখে জানালেন, তাঁর চোখের সামনে তাঁর বাবাকে, ভাইকে কেটে ফেলেছিল দাঙ্গাবাজরা। মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁর বাবা কোনোরকমে বলতে পেরেছিলেন, 'ভাগ, মিলখা ভাগ।' সেই শেষকথাগুলি বৃদ্ধ মিলখার কানে শেষদিন পর্যন্ত বেজেছে। তাঁর জীবন নিয়ে যে-ছবি হয়েছে তার নামটিও 'ভাগ মিলখা ভাগ।' মিলখা ভাগলেন। পিছনে পিছনে তাড়া করে এল দাঙ্গাবাজরা। কোনো রকমে কাছের রেলস্টেশনে গিয়ে এক মহিলা কামরায় উঠে যাত্রীদের কাছে হাত জোড় করে নিজের অসহায় অবস্থার কথা বললেন। ততক্ষণে দাঙ্গাবাজরা তাঁর খোঁজে কামরার পর কামরা চষে ফেলছে। সেই কামরার মহিলারা তাঁকে অভয় দিলেন। তাঁদেরই কারো বোরখার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন মিলখা। ট্রেন ছেড়ে দিল। মিলখা চলে এলেন দিল্লিতে। কপর্দকহীন। কুসঙ্গে পড়লেন। বিনা-টিকিটের রেলযাত্রী হিসেবে ধরা পড়ে আড়াই টাকা জরিমানা দিতে না পেরে জেলে গেলেন। দিল্লিতে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে তাঁর এক দরিদ্র আত্মীয়াকে শ্বশুরবাড়িতে অকথ্য লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। মিলখা এ জন্য তাঁদের খুব দোষ দেননি। 'যারা নিজেরা দুটো রুটির ব্যবস্থা করতে জেরবার হয়ে যায়, তাদের যদি তিনটে রুটির ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে ...।' তার পর একদিন মিলখা সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। তখন তিনি অলিম্পিক কিংবা ১০০/২০০/৪০০ মিটার দৌড় শব্দগুলোও কোনোদিন শোনেননি। তার পরের ঘটনা তো ইতিহাস।

মুসলমান দাঙ্গাবাজরা তাঁর বাবাকে চোখের সামনে কেটে ফেলেছিল। আবার মুসলমান মহিলাদের স্নেহানুগ্রহেই তাঁর প্রাণ বেঁচেছিল। আবার যাদের কুসঙ্গে পড়ে তিনি নষ্ট হতে বসেছিলেন তারা সকলেই মুসলমান ছিল না। এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য তিনি কখনো ভোলেননি। কোনো একটামাত্র পরিচয় দিয়ে মানুষকে বিচার করবার ভুল তিনি না-করতে শিখেছিলেন। সাক্ষাৎকারে আবেগমথিত স্বরে বলেন, 'কীসের হিন্দুস্তান, কীসের পাকিস্তান, এসব কিছুই তো জানত না, বুঝত না গাঁ-গেরামের ওই গরিব লোকগুলো, তবু কোথা থেকে কী যে হল!'

তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের ওপর। যে-দেশে তাঁর নিজের গ্রামে তাঁর পিতাকে তরোয়াল দিয়ে কেটে খুন করা হয়েছে, সেদেশের মাটিতে তিনি পা রাখবেন না। তাই ১৯৬০-এ পাকিস্তান থেকে যখন আহ্বান এল তিনি সটান না বলে দিলেন। জানতে পেরে নেহরু তাঁকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, একেকটা সময় একেকটা দেশের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। সেই ঝড়ে কতকিছু তছনছ হয়ে যায়। সেসব দুঃখ ভোলার নয়। কিন্তু চলমান জীবনের দাবি সবার ওপর। সুতরাং ক্রীড়াবিদ হিসেবে মিলখার অবশ্যই পাকিস্তান যাওয়া উচিত। মিলখা রাজি হলেন।

ওয়াগায় সীমান্ত পেরিয়ে দেখেন, এলাহী কাণ্ড। জিপে করে লাহোর যেতে যেতে দেখলেন দুপাশে সারি সারি লোক, তাদের হাতে ভারত আর পাকিস্তান দুদেশের ঝাণ্ডা। সংবর্ধনার বহর দেখে মিলখা অভিভূত। লাহোরের স্টেডিয়ামে ষাট হাজার লোক। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁ উপস্থিত। পাকিস্তানের দুর্ধর্ষ দৌড়বীর আব্দুল খালিক (১৯৩৩-৮৮) তখন এশিয়ায় মিলখার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। খালিককে হারাতে পারলে তিনি হবেন একশো/দুশো/চারশো মিটার দৌড়ে এশিয়ার মুকুটহীন রাজা। টানটান উত্তেজনা। সারা স্টেডিয়াম জুড়ে স্থানীয় নায়ক খালিকের নামে উত্তাল জয়ধ্বনি। দুশো মিটার দৌড় শুরুর ঠিক আগে এক মৌলবী সাহেব এসে খালিককে 'খুদা হাফিজ' জানিয়ে তাঁর জয়ের জন্য প্রার্থনা করে গেলেন। মৌলবী মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মুখে মিলখা তাঁকে ডাকলেন, 'মৌলবী সাহেব, এটা কেমন হল? আমার জন্য প্রার্থনা না-করেই চলে যাচ্ছেন?' অপ্রস্তুত মৌলবী সাহেব ফিরে এসে বললেন, 'হাঁ বেটা, ভুল হয়ে গেছে।' বলে মিলখার জন্যও প্রার্থনা করলেন। দৌড় শুরু হল। দেড়শো মিটার অব্দি দুজনে প্রায় সমান-সমান, সামান্য এগিয়ে খালিক; শেষ পঞ্চাশ মিটারে যেন হাওয়ায় উড়ে গেলেন মিলখা। অন্তত আট মিটারের দূরত্বে হারালেন খালিককে।

পদক নেবার সময় প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ বললেন, 'তুমি তো পাকিস্তানের মাটিতে আজ দৌড়োওনি, তুমি আকাশে তো ফ্লাইং শিখ হে!' সেই থেকে ফ্লাইং শিখ তাঁর দ্বিতীয় নাম হয়ে গেল, দুনিয়া জুড়ে। সেকথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ একটু ভিজে এল।

সাক্ষাৎকারে তিনি জানালেন, কেন ১৯৬০ সালের অলিম্পিকে জেতা-ইভেন্ট্ তিনি হেরে গিয়েছিলেন। সারা দেশের বিপুল প্রত্যাশার ভারে ইভেন্টের আগের দুদিন তাঁর ভালো ঘুম হয়নি। তা সত্ত্বেও প্রথম থেকেই রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে অন্তত অর্ধেকটা পথ পর্যন্ত তিনি এগিয়েই ছিলেন। হঠাৎই তাঁর মনে হল, এমন পাগলের মতো যে ছুটছি, হঠাৎ যদি দম আটকে পড়ে যাই, তাহলে দেশের কোটি কোটি লোক কী ভাববে! হারিয়ে গেল তাঁর ছন্দ। শেষ পর্যায়ে প্রাণপণ চেষ্টা করেও তিনি আর সেই হারানো ছন্দ ফিরে পেলেন না। এক ধরনের নার্ভাস ব্রেকডাউনই বলা যায় একে। বৃদ্ধ মিলখা বললেন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমার এই ভুলের কথা আমি ভুলতে পারব না।

মিলখার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে আছে পাকিস্তানের আব্দুল খালিক-এর নাম। মিলখার মৃত্যুর খবর পেয়ে খালিক-এর পুত্র মহম্মদ এজাজ স্মৃতিচারণ করেছেন এই বলে যে প্রথমবার তিনি যখন মিলখার সঙ্গে কথা বলেন, মিলখা পাঞ্জাবি ভাষায় 'পুত্' সম্বোধন করে তাঁকে বলেছিলেন, 'দেখ বেটা, তোমার বাবাও এক মস্ত অ্যাথলিট ছিলেন। ওকে হারিয়ে তবেই আমাকে উড়ন্ত শিখ হতে হয়েছে। আমার এই খ্যাতি তো ওরই জন্য।' তার অনেক আগেই মৃত্যু হয়েছে আব্দুল খালিক-এর। তাঁর ইতিহাসও অনেকটা মিলখারই মতন। তিনিও গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিনিও অন্য কিছু করতে না পেরে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ঘটে সেনাবাহিনীর দৃঢ় শৃঙ্খলার পরিবেশে। একের পর এক পদক জেতেন দেশে বিদেশে। তিনিও বহুবার নিশ্চিত জয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত হতে দেখেছেন। আইয়ুব যেমন মিলখাকে 'উড়ন্ত শিখ' উপাধি দিয়েছিলেন, তেমনি নেহরুও খালিককে 'এশিয়ার উড়ন্ত পাখি' আখ্যা দিয়েছিলেন ম্যানিলায় ১৯৫৪-র এশিয়ান গেমসে ১০.৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে রেকর্ড করার জন্য। তফাত একটাই, খালিক মিলখার মতো দীর্ঘজীবী হননি। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

এজাজ একটা চমৎকার কাহিনি শুনিয়েছেন। দুশো মিটারের ওই দৌড়ে মিলখার কাছে হেরে যাবার পর তাঁর পিতা খুব চুপচাপ হয়ে যান। ওর একদিন পর ভারত-পাকিস্তান রিলে রেসে তাঁরা আবার মুখোমুখি। রিলে রেসের শেষ ধাপটায় দৌড়বেন এ-পক্ষ থেকে খালিক আর ও-পক্ষ থেকে মিলখা। 'শোনা যায়, মিলখাজির আগেই বাবার হাতে ব্যাটন পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও বাবা অপেক্ষা করে রইলেন। তারপর মিলখাজি কাছাকাছি আসবা-মাত্র তাঁকে বললেন, ''মিলখা সাহেব, অব জোর লগানা।'' পাকিস্তান সেই রিলে রেসে জিতেছিল। পুরোনো কালের অ্যাথলিটদের মুখে শুনেছি, এর পর বাবা তাঁর আগেকার গৌরব ফিরে পান।'

১৯৭১-এ বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি

সেনাবাহিনীর সৈন্য হিসেবে খালিক ভারতীয় সেনার হাতে বন্দি হন। মিলখা সিং মিরাট জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন, জেলের কর্তাদের বলেন খালিক যাতে অকারণে কষ্ট না পান। আজকের ভয়ংকর জাতীয়তাবাদী জমানায় মিলখার একাজ নির্ঘাত দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য হত। কিন্তু মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বী যে জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বী নন, সেকথা আর কেউ না জানুক, মিলখা খুব ভালো করেই জানতেন। দৌড়ক্ষেত্রে যাঁরা ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী, এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য যাঁদের মরণপণ রেষারেষি, মাঠের বাইরে কিন্তু তাঁদের সম্পর্কটা ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধার, ভালোবাসার। সেখানে দেশ, জাতি, ধর্ম, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত-অনভিজাত কিছুই বিবেচ্য ছিল না। যতদিন 'বিগ মানি, বিগ ক্যাপিটাল' খেলাধুলার জগত থেকে দূরে ছিল, ততদিন ওই জগতটা এইরকমই ছিল; এখন নেই। মিলখা জানিয়েছেন, তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি হয়েছিল বটে, কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যালান্সে তার বিশেষ প্রতিফলন পড়েনি। লালা অমরনাথ তাঁকে বলেছিলেন, টেস্ট খেলার সময় তাঁরা দিনে পাঁচ টাকা হাতখরচ পেতেন। কী জানি, এক এক সময় মনে হয়, ক্রীড়াবিদরা ক্রোড়পতি না হলেই বোধহয় ভালো ছিল।

মিলখা সিংয়ের এই অবিশ্বাস্য জীবনকাহিনি শোনবার পর যখন ভাবি, এই মানুষটিকে নিয়ে কতই না ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি আমরা ছোটোবেলায়, তখন লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসে। মিলখাজি, আপনি যেমন সত্যিকারের ক্রীড়াবিদ সুলভ উদারতায় আপনার পিতার হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, তেমনই ক্ষমা করে দিন কাণ্ডজ্ঞানহীন বাঙালিদের শূন্যগর্ভ আত্মম্ভরিতাকে।

উমা

করোনার দ্বিতীয় অভিঘাত ও জনস্বাস্থ্য ভাবনা

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

পৃথিবীতে এমন কোনও মানুষ বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে নিজের ভাল চায় না। অর্থাৎ নিজে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বাঁচুক, সেটা চায় না। তবে তার কিসে ভাল হবে, সেটা বোধহয় সব সময় মানুষ ঠাহর করে উঠতে পারে না। এর কারণ বহুবিধ। তবে একটা কারণ মনে হয়, এই জটিল স্বার্থপর পৃথিবীতে বিশ্বাস ও ভরসা করার মতো মানুষের বড় অভাব। তাই সঙ্কটকালে নিজের উপর আস্থা ভুলে দিকভ্রান্তের মতো তাকে ছুটতে দেখা যায় কোনও সময়ে ধর্মগুরু, কখনও কূলগুরু অথবা মোড়ল বা নিদেনপক্ষে পাড়ার দাদা তথা রাজনৈতিক নেতার পরামর্শ নিতে; করণীয় কী তা জানতে।

করোনা অতিমারি কালেও যে এমনটা হবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নিজের চোখ-কান-মস্তিষ্কের উপর ভরসা না করলে, এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার যে পাওয়া যাবে না, তা তাকে বোঝায় কার সাধ্য। অথচ বিষয়টা যেহেতু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত, চিকিৎসক-বিশেষজ্ঞদের নিদানই যে গ্রহণযোগ্য, জনতা-জনার্দনকে এটা বুঝতে হবে।

যে কোনও শারীরিক সমস্যা, তা সে সামান্য গা ম্যাজম্যাজ করা থেকে দাঁত ব্যথা, পেটের সমস্যা থেকে হাঁটুর ব্যথা, আমাদের স্বাভাবিক জীবনছন্দ ব্যাহত করে। কাজে মন লাগে না। ঘুরে ফিরে মন শরীরের পাশে দাঁড়াতে চায়।

সংক্রামক রোগে শরীর খারাপের অভিজ্ঞতা কম-বেশি আমাদের সকলেরই আছে। তাতে অবশ্য প্রত্যেকের ক্ষেত্রে রকমফের আছে। একই ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস-ঘটিত সংক্রামক রোগে কেউ অল্পেতেই বেশ কাবু হয়ে পড়ে, আবার কেউ হয়তো বেশি ভোগে না। নিজস্ব রোগ-প্রতিরোধী ব্যবস্থাপনা বা ইমিউনিটি সাধ্যমত লড়ে। কিন্তু শত্রু যখন শক্তিশালী ও কৌশলী, প্রত্যেককে বেগ পেতে হয়।

আপাতত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমাদের দেশে তথা রাজ্যে করোনা দ্বিতীয়বার সংক্রমণের ঢেউ তুলেছে। প্রত্যেকদিন দেশের নিরিখে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ নতুন সংক্রমণ ঘটাচ্ছে, যা এই রাজ্যে ১৫ হাজারের উপর।

'করোনা বলে কিছু নেই'; 'শুধু কর্পোরেট জগত ও মিডিয়ার প্রচার', 'ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সাধারণ সর্দি-কাশির সমস্যা' অথবা 'এমনিতেই 'হার্ড ইমিউনিটি' তৈরি হয়ে করোনা নিকেশ হবে' ব'লে যাঁরা এখনও মনে করেন,

তাঁদের আর একবার ভাবতে বলছি। সমস্যা যে আমার-আপনার স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত, একবারের জন্য হলেও তা মেনে নিন। এটা যেহেতু জনস্বাস্থ্যের সমস্যা, সমাজের যে কোনও মানুষের মতো আপনিও আক্রান্ত হতে পারেন। আর শরীর খারাপ হলে, কাজের সঙ্গে মন-মেজাজও কিন্তু আপনার বিগড়ে যাবে। কোভিড-পরবর্তী জটিলতা (পোস্ট কোভিড কমপ্লিকেশন) কিন্তু আপনার ফুসফুস, কিডনি, নার্ভ, হাঁটু চিরকালের মতো নড়বড়ে করে দিতে পারে।

কোভিড-১৯ সৃষ্টিকারী করোনা ভাইরাস কি বায়ুবাহিত? নাকি বড় জলকণা বা ড্রপলেটের মাধ্যমেই তা মানুষে মানুষে ছড়ায়, এই বিতর্ক করোনা অতিমারীর গোড়ার থেকেই রয়েছে। সম্প্রতি প্রথম সারির মেডিক্যাল জার্নাল 'ল্যানসেট'-এ 'কমেন্ট' বিভাগে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন আবার সেই বিতর্ককে উস্কে দিয়েছে। এই প্রতিবেদনে আমেরিকা, ব্রিটেন এবং কানাডার মোট ছ'জন বিজ্ঞানী দাবি করেছেন, কোভিড সৃষ্টির জন্য বাতাসে ভেসে বেড়ানো করোনা ভাইরাস সম্বলিত ছোট আকারের জলকণা (এরোসল)-ই মূলত দায়ী। গত বছর জুলাই মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র তরফে জানানো হয়, নভেল করোনা ভাইরাস ক্ষেত্রবিশেষে বায়ুবাহিত হতে পারে। এর প্রেক্ষিতে, ক্লিনিক্যাল ডিজিজ জার্নালে প্রকাশিত হয় হু-কে লেখা ৩২টি দেশের ২৩৯ জন বিজ্ঞানীর একটি খোলা চিঠি। এতে করোনা-নির্দেশিকা বদলের আর্জি জানানো হয়। বলা হয়, এই ভাইরাস 'এরোসল' মারফত বাতাসে অন্তত ঘণ্টা তিনেক সক্রিয় থাকে। এই বিষয়ে অবশ্য আরও গবেষণা ও নিরীক্ষণের প্রয়োজন। কারণ শুধুমাত্র বায়ুবাহিত হলে, সারা বিশ্বে তথা ভারতে সংক্রমণের হার আরও অনেকগুণ বেশি হওয়ার কথা ছিল, যেটা হয়নি।

এবার আসি, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এর বিষয়ে। দ্বিতীয় অভিঘাত যে আগের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক হবে, এই আশঙ্কা ছিলই। আগের ঢেউ-এ এক প্রকারের করোনা ভাইরাস (পরিভাষায়, ডি ৬১৪ জি) দেখা গেলেও, জিন মিউটেশনের ফলে এবারে আরও চার ধরনের ভাইরাস, যেমন— ব্রিটেন ভ্যারিয়্যান্ট (বি. ১.১.৭), সাউথ আফ্রিকা ভ্যারিয়্যান্ট (বি. ১.৬১৭) প্রায় গোটা দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে ব্রিটেন ভ্যারিয়্যান্ট যেমন অত্যধিক সংক্রামক (ছোঁয়াচে), অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্যারিয়্যান্ট-এ রয়েছে আমাদের ইমিউনিটিকে ধোঁকা দেবার ক্ষমতা। ব্রাজিল ভ্যারিয়্যান্ট (বি.১.১.২৪৮)-এর আবার মারণক্ষমতা অল্প হলেও বেশি। দেশীয় ডাবল মিউট্যান্ট (ই ৪৮৪ কিউ এবং এল ৪৫২ আর) করোনা এতটাই সংক্রামক যে, তা চুপচাপ ফুসফুসের ক্ষতি করছে, আক্রমণ করছে কম বয়সীদের, এমনকি শিশুদেরও। এবারের রোগ লক্ষণেও ঘটেছে নজর-কাড়া কিছু তফাত। চোখ লাল হওয়া (কনজাংটিভাইটিস), ত্বকে লাল চাকা চাকা দাগ (র‍্যাশ), মাথা ধরা, জিব লাল রঙের হওয়া, পাতলা পায়খানা, গা ম্যাজম্যাজ করা ও প্রবল ক্লান্তি ভীষণ মাত্রায় দেখা যাচ্ছে। শুকনো কাশি, হাল্কা জ্বর বা শ্বাসকষ্টের মতো করোনার প্রতীকস্বরূপ (টিপিক্যাল) উপসর্গ তো সঙ্গে থাকতেই পারে।

ভীষণমাত্রায় ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা থাকলেও মৃত্যুহার (মর্টালিটি) বাড়ছে না ঠিকই, কিন্তু দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে আক্রান্ত হচ্ছেন, ৫ শতাংশ মানুষেরও যদি মেডিক্যাল অক্সিজেন লাগে অথবা ২ শতাংশ মানুষের মৃত্যু হয়, সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। এটা বুঝতে হবে, বর্তমানে বিদ্যমান সংক্রামক, অসংক্রামক ও পুষ্টিজনিত সমস্ত রকম রোগে বা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর উপর এই সংখ্যাটি জুড়ছে। তাই করোনার মৃত্যুহার কম বলেই একে গুরুত্বহীন ভাবার কোনও কারণ নেই।

করোনার দ্বিতীয় অভিঘাত সামলাতে কতগুলো রক্ষাকবচ মাথায় রাখতে হবে। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল নিজেদের শরীরের কোষগুলোকে ভাইরাসের সংশ্রব থেকে যথাসম্ভব দূরে রাখা। জমায়েত ও ভীড় হয় এমন জায়গা (বাজার, বাস, লোকাল ট্রেন) খুব প্রয়োজন না থাকলে এড়িয়ে চলা প্রথম রক্ষাকবচ। কম করে ৬ ফুট (সম্ভব হলে আরও বেশি) দূরত্ব-বিধি মেনে চলা হল দ্বিতীয় রক্ষাকবচ। সঠিক গুণমানের মাস্ক সঠিকভাবে পরা এবং সাবান জলে হাত ধোয়া ও স্যানিটাইজার ব্যবহার করা হল যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ রক্ষাকবচ। আর এত সত্ত্বেও ড্রপলেট বা ড্রপলেট নিউক্লিয়াই-এর মাধ্যমে ভাইরাস কণা নাক, মুখ, চোখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করলেও তার দাদাগিরিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে নিতে হবে ভ্যাকসিন। এটাই পঞ্চম রক্ষাকবচ। তাই সুযোগমত টিকা নিয়ে নিলে আমরা আর একটি সুরক্ষাবলয় বাড়াতে পারব। টিকার দুটি ডোজ নেওয়ার ১৪/১৫ দিন পরে আমাদের শরীরে যে পরিমাণ প্রতিরোধ ক্ষমতা (অ্যান্টিবডি ও টি-লিম্ফোসাইট কোষ) তৈরি হবে, তা ভাইরাসকে শরীরে ঢুকতে প্রতিহত করতে না পারলেও ভাইরাসজনিত শারীরিক

ক্ষতির পরিমাণ অনেকাংশে কমাতে সক্ষম। মৃত্যুর আশঙ্কা তো বটেই। টিকা নেওয়ার লাভ এখানেই।

আমাদের দেশে যে সমস্ত নতুন প্রকারের করোনা ভাইরাসের খোঁজ পাওয়া গেছে, তাদের ক্ষেত্রেও একই ফল পাওয়া যাবে টিকা নেওয়া থাকলে, এটাই আশা করা হচ্ছে। এই বিষয়ে গবেষণার কাজ চলছে। ফল আশানুরূপ না হলে, টিকা উৎপাদনে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

করোনা ভাইরাস আমাদের কোষের ভিতর তার বংশবিস্তার (মাল্টিপ্লিকেশন) কালে পরবর্তী প্রজন্মের ভাইরাসের উপাদানে পরিবর্তন (মিউটেশন) ঘটিয়ে ফেলছে। এই জিন পরিবর্তন কখনও ভাইরাসের অস্তিত্বের পক্ষে যাচ্ছে, কখনও বা বিপক্ষে। অনুকূল-পরিবর্তন স্থায়ী হলে, তৈরি হচ্ছে নতুন রূপের ভাইরাস বা ভ্যারিয়্যান্ট। যখন এই ভ্যারিয়্যান্টগুলোকে নিয়ে রোগ বিস্তার ও ক্ষয়-ক্ষতি বিষয়ক পর্যালোচনা করা হচ্ছে, তখন এদের বলা হচ্ছে, 'ভ্যারিয়্যান্ট আণ্ডার ইনভেস্টিগেশন'। এই ভ্যারিয়্যান্টগুলো যখন রোগ সৃষ্টির নিরিখে বিপদের মনে হচ্ছে, তখন তাদের বলা হচ্ছে 'ভ্যারিয়্যান্ট অফ কনসার্ন'। আর যখন ভ্যারিয়্যান্টগুলো নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন এদেরকে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে 'স্ট্রেন'। সাধারণত ভ্যারিয়্যান্ট ভাইরাসগুলোর জিনোমের উপাদানে একাধিক মিউটেশন হওয়ায়, তার জিন-সজ্জায় এতটাই পরিবর্তন হচ্ছে যে মূল ভাইরাসের থেকে সেটা অনেকটা অন্যরকম। সেক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে নতুন বংশপরিচিতি — লিনিয়েজ (যেমন, বি.১.১.৭, বি. ১.৩৫১ ইত্যাদি)।

পরিশেষে বলি, প্রকৃতির উপাদান ভাইরাস নিজস্ব খেয়ালে (পড়ুন কৌশলে) তার রূপ বদল করবে, ক্ষেত্রবিশেষে ভয়ঙ্কর হয়েও উঠবে। কিন্তু তার বেঁচে থাকার শর্ত তথা লক্ষ্য যেহেতু আমাদের কোষ, ভাইরাস আমাদের শরীরের শত্রু-ই। আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই তাই লড়াইটা চালাতে হবে। তাই প্রয়োজন এই বিষয়ে সম্যক ধারণা ও লড়াইয়ে কৌশলী প্রয়োগ।

করোনার দ্বিতীয় অভিঘাত আমাদের এই মুহূর্তে সামলাতেই হবে। এটা একটা সামগ্রিক সমাজ-কল্যাণের বিষয়। করোনার ব্যাপারে উদাসীন থাকার বা ভিন্নমত পোষণের সময় এটা নয়। করোনা প্রতিরোধে জনসাধারণকে যুক্ত করা যে কতটা জরুরি, সেটা অনুধাবনের জন্য ভিয়েতনামের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগতে পারে। আমাদের রাজ্যের মতো সাড়ে ৯ কোটির একটি দেশ ভিয়েতনাম। শুধুমাত্র জনগণকে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুক্ত করে অসামান্য সাফল্য পেয়েছে ভিয়েতনাম। কনট্যাক্ট ট্রেসিং, টেস্টিং ও আইসোলেশন করার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি জন-সচেতনার কাজ করেছে তারা। গানের (হিংসুটে করোনা) মাধ্যমে রোগটি সম্পর্কে জানানো ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বাড়িয়ে কিভাবে করোনাকে হারাতে হবে, সে শিক্ষা দেওয়া হয়। সরকার এগিয়ে আসে আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর মানোন্নয়নে। গতবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে ও জুলাই-আগস্ট মাসে দুটি করোনার অভিঘাতে মোট ১৪৬৫ জন আক্রান্ত হলেও গোটা দেশে মৃত্যু হয় মাত্র ৩৫ জনের।

করোনার মতো জনস্বাস্থ্যের লড়াইয়ে তাই জনগণকে যুক্ত করার প্রয়াস আমাদের এখানেও অগ্রাধিকার পাক। **উমা**

একটি প্রতিবেদন

বড়জাগুলি বিদ্যাসাগর কমিটির উদ্যোগে নির্ভয়ার মৃত্যুদিনে আলোচনাচক্র

বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটি জাগুলির পক্ষ থেকে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ আয়োজিত হল বিশেষ ভার্চুয়াল সেমিনারের। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন।

২৯ ডিসেম্বর ২০১২ দিল্লিতে পাশবিকভাবে যৌন নির্যাতন করা হয় নির্ভয়াকে। ধর্ষণকারীরা মৃতপ্রায় নির্ভয়াকে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালায়। কয়েকদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হেরে যায় নির্যাতিতা তরুণী। এই গণধর্ষণের কয়েকবছর পরে আদালতের রায়ে বেশিরভাগ ধর্ষণকারীর সাজা হয়। কিন্তু তারপরেও থামে নি নারী নির্যাতনের বহর। হায়দ্রাবাদে প্রিয়ঙ্কা রেড্ডি, কামদুনির কিশোরী, হাথরসের তরুণী— একের পর ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই ভার্চুয়াল আলোচনাসভার বিষয় ছিল 'বিদ্যাসাগর, নারী সমাজ ও বর্তমান নারী নির্যাতন'। প্রধান বক্তা হরিণঘাটার ফতেপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুদিন ভট্টাচার্য বর্তমান নারী নিগ্রহের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের নারীকল্যাণ কর্মকাণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। কার্মাটরের বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী কমিটির সম্পাদক সুনির্মল দাশ, বড়জাগুলির গোপালচন্দ্র ভৌমিক, সুকুমার কয়াল, শান্তনু কয়াল, বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি নিরঞ্জন বিশ্বাস প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। বক্তারা বর্তমান নারী নিগ্রহের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আদর্শ নিয়ে চর্চার অপরিসীম গুরুত্বের কথা বলেন।

প্রতিবেদক : নিরঞ্জন বিশ্বাস

আর্য রহস্য

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

কত মানুষের ধারা

স্মরণাতীত কাল থেকে বহু মনুষ্যপ্রজাতি এই উপমহাদেশে বিনা বাধায় এসেছে, তার মধ্যে আধুনিক মানুষ এসেছিল (Homo sapiens) ৬০-৭০ হাজার বছর আগে, সে চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে সভ্যতার উন্মেষ অর্থাৎ বিভিন্ন জন্তুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করা, কৃষির ব্যবহার, স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস ইত্যাদি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দের আগে থেকে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধ্ ও বেলুচিস্তানের পাহাড়তলিতে শুরু হয়েছিল। সেখানে লিখনপদ্ধতি, নগরকেন্দ্রিক জীবন আর বহুমুখী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সভ্যতার একটি ক্রম গড়ে উঠেছিল। বেলুচিস্তানের সীমানা থেকে রাজস্থানের মরুভূমি, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে গুজরাটের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত ৮ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারেরও বেশি অঞ্চল জুড়ে সিন্ধু নদী ও তার অন্যান্য শাখানদীর দু'পাশে ছিল এর বিস্তার। এই তথ্য উদ্ঘাটিত হয় বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে যখন প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধু উপত্যকায় এই সভ্যতার প্রাচীনতম দু'টি শহর — হরপ্পা (১৯২১-এ) ও মহেঞ্জোদারো (১৯২২-এ) প্রথম আবিষ্কার করেন। সিন্ধু সভ্যতা নামে খ্যাত এই সভ্যতার আবিষ্কারের আগে ধারণা ছিল বৈদিক বা আর্য সভ্যতাই ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা। কিন্তু কালনির্ণয় করে যখন দেখা গেল এই সভ্যতা আর্য সভ্যতার পূর্ববর্তী তখন একদল সিদ্ধান্ত করলেন যে বহিরাগত আর্যরা এই সভ্যতা ধ্বংস করেছিল।

এ তত্ত্ব অনুসারে পূর্ব ইউরোপ বা মধ্য এশিয়া থেকে আগত এই 'আর্য'রা নাকি এদেশে নিয়ে আসে ভারতীয় সভ্যতার মূল উপাদান যথা বেদ ইত্যাদি হিন্দুধর্মের আদি ভিত্তিগুলো আর সংস্কৃত ভাষার আদিরূপ যা থেকে আর্য ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তি — উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে যে সব ভাষা এখন বলা হয়।

অন্য একদল এ সিদ্ধান্ত নাকচ করে বললেন এ বক্তব্য সাম্রাজ্যবাদীদের। তাদের নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারকে একটা ঐতিহাসিক পরম্পরার অঙ্গ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা। তাঁরা দাবি করলেন আর্য সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়, সিন্ধু সভ্যতা সে সভ্যতারই অঙ্গ। ভারতীয় সভ্যতায় কোনো বহিরাগত প্রভাব নেই। অথচ ঐতিহাসিকরা বলেন যে সিন্ধু সভ্যতাও বিদেশাগতদের তৈরি। তাঁরা মনে করেন আদিমতম ভারতীয়রা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ছড়ানো মুণ্ডা ভাষাগোষ্ঠীর অংশ ছিল। (Danielou p. 6)

সুদূর অতীতে এদের পাশাপাশি একদল বাদামি রঙের, লম্বামাথা, সোজা চুলের মানুষ ভারতবর্ষে দেখা গেল। মনে করা হয় এরা নিশ্চয়ই বহিরাগত এবং অন্য একটা গোষ্ঠীর অন্তর্গত, যারা কোনো প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মধ্যে এরা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। (Danieloup. p13) এদের এবং পরে অন্যান্য আগ্রাসী বহিরাগতদের চাপে শান্তিপ্রিয় নিরীহ মুণ্ডা ভাষাভাষিরা জঙ্গলে ও পাহাড়ে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল যেখানে এদের উত্তরসূরীরা এখনও সরল ও কায়িক জীবন যাপন করে।

কালক্রমে আর্যরা উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম থেকে দ্রাবিড়দেরও মুছে ফেলেছিল, জাতিগতভাবে ও ভাষাগতভাবেও। দ্রাবিড়রা তাদের ভাষা জিইয়ে রাখতে পেরেছিল দক্ষিণে তাদের প্রবর্তিত উপনিবেশগুলিতে। (যেগুলো এখন দ্রাবিড়ভূমি বলে চিহ্নিত)। (Danielou.p 14)

সভ্যতার মন্থন ?

যেটাকে বৈদিক যুগ বলা হয় সেটা ছিল ভারত ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়, যখন একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটছিল যার একপ্রান্তে ছিল সিন্ধু সমতলে অত্যন্ত উন্নত একটি সভ্যতার ক্রম অবক্ষয় ও বিলুপ্তি আর অপর প্রান্তে ভিন্ন চরিত্রের একটি সভ্যতার উত্থান।

সিন্ধু সভ্যতা একটি সুপরিকল্পিত নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা, অন্যদিকে আর্য সভ্যতা একটি সরল গ্রামীণ সভ্যতা। তাই সিন্ধু সভ্যতার প্রচুর প্রত্ন নিদর্শন রয়েছে, আর্য সভ্যতার নেই। তবে যদিও সিন্দু সভ্যতা লিখন পদ্ধতি জানত কিন্তু সে লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি তাই সে সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান কোনো লিখিত উপাদান নির্ভর নয়। আর প্রত্নতত্ত্ব থেকে আর্যদের সম্বন্ধে

কিছু জানা না গেলেও গঙ্গা অববাহিকায় এদের সাংস্কৃতিক বিস্তার ও বিবর্তনের প্রাথমিক স্তর সম্বন্ধে বর্তমান জ্ঞান প্রধানত ও প্রায় একমাত্র একগুচ্ছ ধর্মীয় রচনা — বেদ, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ থেকেই পাওয়া। তবে এগুলো মূলত ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত। সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোষগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। এগুলো কতক স্তোত্রের সমষ্টি, বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। (ভট্টাচার্য, পৃ. ১৩)

বেদের মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে প্রাচীনটি হল ঋক্‌বেদ। এতে রয়েছে ভারত উপমহাদেশের উত্তরে আর্যরা যখন এল তখন তাদের অভিজ্ঞতার কথা। তারা অপ্রত্যাশিতভাবে এক অত্যন্ত অবাক করা বিকশিত সভ্যতার বিস্ময়কর সব নগরের মুখোমুখি হল।। সেখানে যারা বাস করত তাদের উল্লেখ করা হয়েছে কালো চামড়ার অসুর বলে। যাদের প্রতিষ্ঠান ও বিশ্বাস যাদু ও নারকীয়। এর অনেক স্তোত্রে রয়েছে ভারতের অধিবাসীদের প্রবল বাধার ইঙ্গিত। ছত্রভঙ্গ, বিপর্যস্ত সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা পর্যুদস্ত হয়ে আর্যদের দাসে পরিণত হল।

ঋকবেদের শেষের দিকের স্তোত্র পুরুষ শুক্ততে সর্বপ্রথম দেখা যায় যে দাসেদের একটা সামাজিক অবস্থান স্থির করে দেয়া হয়েছে। তাদের নাম দেয়া হয়েছে 'শূদ্র'। আর্য রাজত্বে তাদের চতুর্থ বর্ণ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এদের মানুষ বলে গণ্য করা হচ্ছে । তবে তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে চাইলে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। (পরিস্থিতিটা সে থেকে তেমন কিছু বদলেছে কি?)

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিরোধ চলা সত্ত্বেও আর্যরা ক্রমে সংস্কৃতিতে উন্নত কিন্তু পরাজিতদের সেই সব বিধান ও বিশ্বাস ক্রমে আত্মস্থ করে নিয়েছিল যেগুলো তারা প্রথমে নারকীয়, পাপ ও যাদু মনে করেছিল। ধর্মীয় ও দার্শনিক পর্যায়ে প্রগার্যদের উপলব্ধি ও ধারণা তারা গ্রহণ করেছিল। যাযাবর পশুচারী আর্যরা কৃষি শিখেছিল তাদের কাছ থেকেই, লিখতেও। চতুর্থ ও শেষ বেদ, অথর্ববেদে এর চিহ্ন আছে। (Danielou p. 42-3)

প্রত্নতত্ত্ব থেকে জানা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ বছরের পরবর্তী শতকগুলোতে সিন্ধু সভ্যতার ক্রম অবনতি ঘটেছিল। এই অবক্ষয়ের সম্ভাব্য কারণ বহুদিন ধরে পণ্ডিতদের ভাবিয়েছে। কিছু কিছু ঐতিহাসিক মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত আক্রমণকারীরা সিন্ধু সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে বলে বিবেচনা করেছেন। কিন্তু এই মত নতুন করে বিবেচনাধীন। এ থেকে বেশি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হচ্ছে ঘনঘন বন্যা, ভূত্বকের আলোড়ন, জমির লবণায়ন ও মরুকরণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণ। আর্যরা যখন এসেছিল তখন সেই অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত

প্রথাগতভাবে ইতিহাস নির্ভর করে লিখিত উপাদানের ওপর। অন্যদিকে প্রাগৈতিহাসিক সংক্রান্ত তথ্য আহরিত হয় হারিয়ে যাওয়া শহর আর ফেলে দেয়া ভাঙা পাত্রের টুকরো-টাকরা মাটি খুঁড়ে বার করে। বর্তমানে বংশগতি বিষয়ক শাস্ত্র (Genetics) এসে মানুষের অতীত উন্মোচিত করে দিচ্ছে। যা থেকে পণ্ডিতেরা কালের গভীরে দেখতে পান আর আশ্রয় সন্ধানী পরিযায়ীদের যাত্রাপথের সন্ধান পান যেগুলো কল্পকথা বা লোককথা থেকেও পাওয়া যায় না।

দক্ষিণ এশিয়ার চারপাশের অঞ্চলগুলোর বংশগতির বিন্যাস (Genetic Patterns) বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ভালভাবে জেনেছেন। মধ্য এশিয়ার বৃক্ষহীন বিশুষ্ক তৃণপ্রধান প্রান্তর থেকে পশুচারকরা উত্তর পশ্চিম এলাকায় এসেছিল সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা আপাতত নিশ্চিত। যা থেকে দেখতে পাওয়া যায় যে পশুচারীদের বংশধারা বেশিমাত্রায় রয়েছে উচ্চবর্ণে আর ভারত পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলের গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে। অপরদিকে সিন্ধু সভ্যতার পরিণত পর্ব থেকে যে ক'টি নমুনা পাওয়া গেছে তাতে পশুচারীদের বংশগতির সেই বিশিষ্ট চিহ্ন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই সব সাক্ষ্য খুব জোরালোভাবে নির্দেশ করে যে এই পশুচারক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীরা ২০০০ খ্রিস্টপূর্বর পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ এশিয়ায় পৌঁছেছিল।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক সীমানার মধ্যে সিন্ধুসভ্যতার যে ক'টি নিদর্শন রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া যায় গুজরাতের কচ্ছ জেলার 'রণ'-এ ধোলাভিরা নামে একটি দ্বীপে। ধোলাভিরার কাল নির্ণয় হয়েছে খ্রি. পূ. ৩০০০ বছর। চীনে তখনও সভ্যতার উন্মেষই হয়নি, মিশরের আদি পিরামিডগুলো তৈরি হতে যখন কয়েক শতাব্দী বাকি সেই সময়েই ধোলাভিরায় নগর সভ্যতার আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছিল।সোজা চওড়া রাস্তা, এক অন্যকে লম্বভাবে কাটছে, পুরোপুরি পরিকল্পনা করে তৈরি একটা শহর। নগর সভ্যতার প্রধান দুটি সমস্যা, জলসংরক্ষণ আর জল নিষ্কাষণ, সমাধানে এদের প্রচেষ্টা আধুনিক নগর পরিকল্পনাকেও চমকে দেবে। জলাশয়, খাল, বাঁধ কী নেই! তেমনি ভূগর্ভস্থ নিকাশী নালা পাথরে বাঁধানো। কতগুলো এত বড় যে একজন প্রমাণ আয়তনের মানুষ তার ভেতর

দিয়ে খাড়া হয়ে হেঁটে যেতে পারে।

মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও ধোলাভিরা সহ ভারত ও পাকিস্তানে অন্যত্র প্রায় সত্তরটি প্রত্ন উৎখননে, সিন্ধু সভ্যতার একটা সামগ্রিক ছবি পাওয়া গেছে। এই খননের নবতম সংযোজন রাখিগড়ি, হরিয়ানার হিসার জেলার একটি গ্রাম, দিল্লির ১৫০ কি. মি উত্তর পশ্চিমে।

১৯৬০-এর দশকের শেষার্ধ থেকে এখানে মাঝে মাঝে খনন করা হয়েছে। আর তা থেকে একটা বিস্তীর্ণ এবং স্থায়ী নগরকেন্দ্রিক বসতি হিসেবে এর গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার স্থায়িত্ব খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম সহস্রাব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দ। অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার এটি একটি শহর যা ভারতের প্রথম নগর সভ্যতার উত্থান ও চার হাজার বছরেরও আগে তার রহস্যময় পতনের সাক্ষী।

পুনার ডেকান কলেজ-এর উপাচার্য ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ড. বসন্ত শাঠে-র নেতৃত্বে একটি দল ২০১৫ সাল থেকে এই গ্রামে উৎখনন চালায়। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল প্রকাশিত হয়।

বর্তমান রচনার ক্ষেত্রে রাখিগড়ির সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক উদ্‌ঘাটন এখান থেকে সংগৃহীত নমুনাতে সেই gene-এর সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি— যাকে হাল্কাভাবে 'আর্য gene' নাম দেয়া হয়েছে। পশুচারক জনসমষ্টি যারা মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত বৃক্ষহীন তৃণপ্রান্তর থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল আর কালক্রমে ভারতবর্ষকেও প্লাবিত করেছিল তারা এই gene-এর উৎস। এই অনুপস্থিতি বংশগতি বিজ্ঞানী (geneticist), ঐতিহাসিক ও ভাষাতত্ত্ববিদদের ইতিমধ্যে উপনীত ঐক্যমতকে সুদৃঢ় করে যে সিন্ধু সভ্যতার মানুষেরা গোচারক, অশ্বপালক, রথচালক, কুঠার অস্ত্রধারী, সংস্কৃতের আদিরূপভাষী পরিযায়ীদের, যারা স্পষ্টত উচ্চবংশের ও উত্তরভারতীয়দের পূর্বপুরুষ, তাদের থেকে আলাদা।

ঘোড়ায় টানা রথের ব্যবহারে দক্ষতা অনুপ্রবেশকারীদের যুদ্ধবিগ্রহে ও সুবিধে করে দিয়েছিল যাতে করে অন্যরা এদের বশ্যতা মেনে নিয়েছিল। মোটামুটি খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ থেকে খ্রিঃ পূঃ ৫০০ পর্যন্ত বৈদিক যুগ বলে গণ্য করা হয় যখন আর্য সংস্কৃতি বিন্ধ্য পর্বতমালার উত্তরের ভারতবর্ষের অধিকাংশে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

আর্যদের বহিরাগত ভাবতে নারাজ জনৈক ঐতিহাসিক (চক্রবর্তী, পৃ.১৬১) প্রশ্ন করেছেন ''কি করে ঘোড়ায় চড়া পশুচারক আর্যরা ধীরে ধীরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট জটামুকুটে সত্যদ্রষ্টাতে রূপান্তরিত হল, রাজা ও রাজত্বের সৃষ্টি হল?'' এর উত্তরে নয়, তবে অন্য এক ঐতিহাসিক এ প্রসঙ্গে অন্যত্র মন্তব্য করেছেন : ''ভারতের প্রথম অধিবাসীদের চর্চা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে প্রযুক্তি ও সভ্যতা সবসময়ে সমার্থক নয়। মনুষ্যগোষ্ঠী অত্যন্ত সরল পার্থিব পরিস্থিতিতে বাস করেও সামাজিক বিধান ও ধার্মিক, দার্শনিক ও শৈল্পিক ধারণাকে প্রকৃত পূর্ণতা দিয়েছে যা আধুনিক সভ্যতারই মূল ভিত্তি, প্রায়শই সূক্ষ্মতার এমন পর্যায়ে, এবং দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের বাস্তবতা সম্বন্ধে এমন স্বতঃজ্ঞান নিয়ে যে আমাদের নিজেদের ধারণাগুলোকে তুলনায় শিশুসুলভ ও সত্যিই আদিম মনে হতে পারে।'' (Danielou, p2)

১৯৯০-এর দশকে সেই দাবিকে বেশ ব্যাপক স্তরে ছড়িয়ে দেবার প্রক্রিয়া শুরু হল (পরবর্তীকালে সরকারি স্তরে এটিকে প্রচুর উৎসাহ দেয়া হয়েছে) যে 'সিন্ধু সভ্যতা কেবল যে আর্য সভ্যতা তা নয়, এটি বৈদিক কিংবা উত্তর বৈদিক— ঋকবেদ যে সময়কালে রচিত বলে বর্তমানে বিশ্বাস করা হয়, প্রকৃতপক্ষে এটি তার থেকে অনেক প্রাচীনতর রচনা, বলতে গেলে সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক কোনো সময়ের বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বের আগের রচনা এটি।' এও বলা হল যে 'বৈদিক আর্য সংস্কৃতি ভারতের মূল সংস্কৃতি এবং আর্যরা পুরোপুরি এই উপমহাদেশের স্বদেশজাত এবং তারা সর্বপ্রাচীন অধিবাসী'। (হাবিব, সিন্ধুসভ্যতা, পৃ. ৭৮)

দক্ষিণ এশিয়ার বিপুল সংখ্যক পেশাদার প্রত্নতাত্ত্বিক আর ঐতিহাসিক, ভারতীয় অভারতীয় দুই-ই, এই মতগুলিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। এবং এর সপক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে যেগুলো প্রস্তাব করা হচ্ছে এবং সেগুলোর সপক্ষে যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে তার যৌক্তিকতা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না। গ্রহণযোগ্য সব সাক্ষ্যপ্রমাণের অভিঘাত অত্যন্ত পরিষ্কার — ঋকবেদের সমগ্র রচনা সিন্ধু সভ্যতার, অর্থাৎ খ্রিঃ পূঃ ২০০০ বছরের, যথেষ্ট পরবর্তী। (ঐ, পৃ. ৮৩)। (আর ভারতের সর্বপ্রাচীন অধিবাসীদের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মত অগেই বলা হয়েছে।)

অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতা আর্য সভ্যতার উত্তরসূরী নয়, সে সভ্যতার অঙ্গও নয়। বরঞ্চ এ দু'টি ভিন্ন চরিত্রের সভ্যতার সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে ভারতের সভ্যতা।

সত্যদ্রষ্টা কবি তাই ভারতবর্ষকে বলেছেন 'মহামানবের সাগর'। বলেছেন, 'কত মানুষের ধারা' এসে সেই 'সমুদ্রে হল হারা'। তাঁর বিজ্ঞানচেতনা তাঁকে দিয়ে বলিয়েছে, ''আমার

শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর''। উগ্র জাত্যাভিমানে অন্ধ হয়ে ইতিহাসের এই শিক্ষাকে নস্যাৎ করে একদল দাবি করে চলেছে হিন্দু সংস্কৃতিতে কোনো বহিরাগতের কিছুমাত্র অবদান নেই। শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জোরে ভারতের শাশ্বত সাধনা, সমন্বয়ের এই ইতিহাস তারা আমাদের ভুলিয়ে দিতে চাইছে। চাইছে কবির স্বপ্নের ''একটি বিরাট হিয়া''-কে অস্বীকার করতে।

উল্লেখপঞ্জী

1.Alain Danie'lou, 2003; A brief history of India: Inner Traditions, Rochester, Vermount

2 ইরফান হাবিব ২০০৪ : সিন্ধু সভ্যতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

3. দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ১৯৯৯ : ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ

4. সুকুমারী ভট্টাচার্য, ১৯৯৮ : প্রাচীন ভারত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

সহায়ক পাঠ —

1. Sanjeev Sanyal, Land of Seven Rivers, 2012, Pengiun

2. Romila Thapar (Ed) 2019, Which of us are Aryans? Rethinking the concept of our origins. Aleph Books, N. Delhi

উমা

সামাজিক মাধ্যম এবং বাক্-স্বাধীনতা — সমস্যা ও সম্ভাবনা

সৌরভকুমার মোদক

ভূমিকা :

বাক্-স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ ও তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সুযোগ বর্তমান সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে। কয়েক বছর পূর্বেও আধুনিক সামাজিক মাধ্যমগুলির, বিশেষত 'অনলাইন ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া'র রমরমা তেমন ছিল না; যদিও এর 'ডিজিটাল ভারসান'গুলির জন্ম খুব বেশি দিনের পুরনো নয়। বর্তমানে বাক্-স্বাধীনতা প্রকাশের সামাজিক মাধ্যমের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও ততই সামনে আসছে। রাষ্ট্র বা সরকার কর্তৃক অযথা হস্তক্ষেপ তো আছেই পাশাপাশি রয়েছে সামাজিক মাধ্যমের নিজস্ব ক্ষেত্র; যেখানেও বাক্-স্বাধীনতা মাত্রাতিরিক্তভাবে বিপন্ন হচ্ছে। একজনের স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ অন্যের ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠছে। ক্ষোভ ও পাল্টা ক্ষোভের দ্বন্দ্বে যুক্ত হয়ে পড়ছে একক ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ভাবাবেগ, ধর্ম, মতাদর্শ, নৈতিকতা, সামাজিক সংঘ বা গোষ্ঠী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং রাজনীতি তথা রাজনৈতিক দলের প্রভাব।

ব্যাক্তির স্বাধীন মত প্রকাশ তখনই বিপন্ন বলে ধরা হবে যখন তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ধরণগুলো মাত্রাছাড়া হয়ে যায়; ক্ষমা চাওয়ানোর জন্য চাপ এমনকি প্রাণনাশের হুমকি ও এই ধরনের নানান চাপ সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটিয়ে ব্যক্তিকে তার মতামত প্রত্যাখ্যান করানোর ঘটনাও আজকাল সামাজিক মাধ্যমে অহরহ ঘটে চলেছে। এর সাম্প্রতিকতম নানা উদাহরণের মধ্যে অন্যতম দুটির প্রথমটি হল— অগ্রিমা জসুয়া-র ঘটনা এবং দ্বিতীয়টি হল কুনাল কামরা-র ঘটনা। স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান অগ্রিমা জসুয়ার একটি পুরনো ভিডিও ভাইরাল হওয়া, যাতে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের উদ্দেশ্যে অপমানকর মন্তব্য ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে এবং যা মারাঠি জন সম্প্রদায়ের ভাবাবেগকে আঘাত করেছে বলেও অনেক মানুষ মনে করেছেন ও তাদের চরম ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে সামাজিক মাধ্যম থেকে ভিডিওটি সরিয়ে নেওয়া ও শিল্পী কর্তৃক ক্ষমা চাওয়ার ঘটনাও সামাজিক মাধ্যমকে আলোড়িত করেছে। জসুয়া 'public apology' দিতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন। তিনি লিখেছেন — ''My heartleft apologies to followers of the great leader (Chhatrapati Shivaji Maharaj), who I sincerely respect'' (মহান নেতা ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের অনুগামীদের নিকট আমার আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি; যাকে আমি মন থেকে শ্রদ্ধা করি।)[১] একজন কমেডিয়ান শিল্পীর বাক্-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের এমন নমুনা, যেখানে তাঁর ও পরিবারের উপর দৈহিক আক্রমণ নেমে আসার মতোও ভয়ানক, কুরুচিকর, নেতিবাচক মন্তব্য ও হয়রানি এবং হয়রানির পূর্বাভাস পরিচালিত ও পরিলক্ষিত হয়েছে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য

ঘটনাটি হল আর এক স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান কুনাল কামরার হয়রানি। এই শিল্পীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি 'ইন্দিগো'র বিমানে যাতায়াতের সময় এক প্রতিষ্ঠিত টেলিভিশন সাংবাদিককে 'বিব্রত' করেছেন এবং সেই কারণে ঐ বিমান কর্তৃপক্ষ ছ'মাসের জন্য তাদের বিমানে কুনালের যাতায়াত নিয়েধাজ্ঞা জারি করে; দেখাদেখি অন্য কিছু বিমান কর্তৃপক্ষও উক্ত পথ অনুসরণ করে।[২] এই নিষেধাজ্ঞা শুধু শিল্পীকেই মানসিক যন্ত্রণা দেয়নি, যন্ত্রণা দিয়েছে অনেক মানুষকে। এই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে বিরাট আলোড়িত হয়েছে। অতি সম্প্রতি তিনি অন্য একটি ঘটনায় আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। সেই ঘটনায় বাক্-স্বাধীনতার শর্তসমূহ লঙ্ঘিত হয়েছে বলে মনে করে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছে। কার্টুনিস্ট তানেজার বিরুদ্ধেও সর্বোচ্চ আদালত ঐ একই অভিযোগ এনেছে ও জবাবদিহি তলব করেছে। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও আমরা সামাজিক মাধ্যম ও বাক্-স্বাধীনতার স্বরূপ এবং এক্ষেত্রে সরকারি ও জননিয়ন্ত্রণের বাধ্যবাধকতা বা প্রভাব প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব আর খুঁজে দেখব এর নানান সমস্যা ও তা সমাধানের উপায়।

সামাজিক গণমাধ্যমের স্বরূপ: সামাজিক মাধ্যম (Social Media) বলতে সেই সকল মাধ্যমগুলিকে বোঝায় যার দ্বারা দেশের নাগরিকরা তাদের বাক্-স্বাধীনতার অধিকারকে বাস্তবায়িত করে থাকে। আধুনিক 'সোশ্যাল মিডিয়া' এবং সনাতন বা পরম্পরাগত মাধ্যম (traditional media)— উভয়েই বাক্-স্বাধীনতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। সনাতন মাধ্যমগুলির মধ্যে রয়েছে— সংবাদপত্র, পত্রিকা, বেতার বা দূরদর্শন সম্প্রচার ইত্যাদি। এই সকল সনাতন মাধ্যমগুলির সাথে আধুনিক সামাজিক মাধ্যমগুলির নানান পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের পার্থক্যগুলি মূলত গুণাগুণ, পারদর্শিতা, ব্যবহার, দ্রুততা, ও অংশগ্রহণকেন্দ্রিক এবং অল্প সময়ে ও অল্প খরচে মানুষের কাছে পৌঁছানোর সামর্থ্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সনাতন মাধ্যমগুলির গুণাগুণ আধুনিক মাধ্যমগুলির তুলনায় কিছু ক্ষেত্রে ভালো হলেও জনপ্রিয়তার বিচারে বর্তমানে আধুনিক মাধ্যমগুলি সনাতন মাধ্যম অপেক্ষা এগিয়ে। তবে পূর্বের জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য সনাতন মাধ্যমগুলিও আধুনিক সোশ্যাল মিডিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি আয়ত্ত করার পথে হাঁটছে সময়ের প্রয়োজনে। আধুনিক সামাজিক মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়ার সংজ্ঞায় বলা হচ্ছে— ''Social media are interactive computer-mediated technologies that facilitate the creation or sharing of information, ideas, career interests, and other forms of expression via virtual communities and networks''. (সামাজিক মাধ্যম হল বিমূর্ত সম্প্রদায় ও যোগাযোগ দ্বারা পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল কম্পিউটার মাধ্যমগত প্রযুক্তি যা, তথ্য তৈরি ও তা ভাগাভাগিকে, ভাবনাসমূহ, বৃত্তিগত স্বার্থগুলিকে এবং মতামত প্রকাশের নানান ধরনগুলিকে সহজতর করে।)[৩] সোশ্যাল মিডিয়ার স্বরূপ বা প্রকৃতি হল— ''Social media originated as a way to interact with friends and family but was later adopted by the business which wanted to take advantage of a popular new communication method to reach out to customers. The power of social media is the ability to connect and share information with anyone on Earth, or with many people simultaneously ''. (বন্ধুদের সাথে ও পারিবারিক কথোপকথন বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে সামাজিক মাধ্যমের উদ্ভব ঘটলেও পরবর্তীতে ব্যবসাসমূহের দ্বারা এটি গৃহীত হয়, যারা নতুন জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যমের পদ্ধতির সুবিধা সমূহ নিয়ে তাদের ক্রেতাদের নিকট পৌঁছানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। সামাজিক মাধ্যমের ক্ষমতা, সংযোগের সামর্থ্য এবং একই সাথে পৃথিবীর যে কেউ অথবা অনেক জনমানুষের সাথে তথ্য সমূহের ভাগাভাগির উপর নির্ভরশীল।)[৪]

সোশ্যাল মিডিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল[৫]— ক) সোশ্যাল মিডিয়া হল ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানমূলক (interactive) এক অনলাইন ইলেক্ট্রনিক্স মঞ্চ। খ) ব্যবহারকর্তা কেন্দ্রিক বিষয় যেমন, কোনো পাঠ্য পাঠানো বা মন্তব্য পাঠানো; অনলাইনআলোচনা বা বিতর্কে অংশ নেওয়ার জন্য ডিজিটাল ফটো বা ভিডিও বা তথ্যাদির সঞ্চালন করা--- এইগুলিই হল সোশ্যাল মিডিয়ার জীবনীশক্তি। গ) সোশ্যাল মিডিয়া সংগঠন কর্তৃক উপভোক্তা বা ব্যবহারকর্তাদের স্বার্থে তৈরি করা নানা 'ওয়েবসাইট' বা 'অ্যাপ'-এর নকশা পরিকল্পনা সোশ্যাল মিডিয়াকে অনন্য করে তুলেছে। ঘ) সোশ্যাল মিডিয়া সামাজিক যোগাযোগের 'অনলাইন' প্রগতিকে বিকশিত করে তোলে; যেখানে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সাথে অন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের যোগাযোগ সুনিশ্চিত হয় 'user's profile'-কে কেন্দ্র করে।

এখন প্রশ্ন হল আজকের আধুনিক সোশ্যাল মিডিয়া কোনগুলি? বর্তমানের সোশ্যাল মিডিয়াগুলির মধ্যে অন্যতম কয়েকটি হল— ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক মেসেঞ্জার, উইচ্যাট (weChat), ইনস্ট্রাগ্রাম ইত্যাদি। এর মধ্যে সারা বিশ্বে 'ফেসবুক' ব্যবহারকারীর সংখ্যা জানুয়ারি ২০১৯-এর এক হিসাব অনুযায়ী ২.২৭ বিলিয়ন।[৬]

বাক্-স্বাধীনতার অর্থ ও শর্ত: বাক্-স্বাধীনতা বলতে সাধারণভাবে কথা বলা ও মতামত প্রকাশের অধিকারকে বোঝায়। আমাদের সংবিধানের ১৯(১) ধারায় নাগরিকদের যে ছয় প্রকার স্বাধীনতার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে তার মধ্যে প্রথমটি হল এই বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার। অধিকারটির স্বীকৃতি গণতন্ত্রের স্বার্থে অপরিহার্য। এই অধিকার অনুযায়ী ভারতের নাগরিকরা নিজেদের চিন্তাভাবনা ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে সক্ষম। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, বই লেখন এবং অধুনা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাগরিকরা যেমন লিখিত আকারে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারেন, ঠিক তেমনি বেতার, দূরদর্শন, সভাসমিতি, বিতর্কসভা, আলোচনাচক্র এবং অধুনা সোশ্যাল মিডিয়ার 'ভার্চুয়াল' কথোপকথন-এর মাধ্যমেও স্বাধীন মতামত প্রকাশিত হয়। এছাড়া চিত্র বা শিল্পকলার মাধ্যমেও শিল্পীর স্বাধীন মতামত প্রকাশের সুযোগ রয়েছে। বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়েছে। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধে নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু সংবিধানে লিপিবদ্ধ কোনওপ্রকার স্বাধীনতার অধিকারই অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাও এর ব্যতিক্রম নয়। নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা যা ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর, তাকে সংবিধান সমর্থন করেনি। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের জন্য সংবিধান তাই এই অধিকারে 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ' আরোপ করেছে।[৭] অর্থাৎ বাক্-স্বাধীনতা শর্তসাপেক্ষ তথা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বিশেষ কিছু কারণে সরকার প্রচলিত আইন অনুসারে বা প্রয়োজনে আইন তৈরি করে বাক্-স্বাধীনতার উপর 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ' আরোপ করতে সক্ষম; যেমন — রাষ্ট্রের নিরাপত্তা,সার্বভৌমতা, সংহতি বজায় রাখা, অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, সুস্থ বৈদেশিক সম্পর্ক বজায় রাখা, অপরাধে উৎসাহ প্রদান বন্ধ করা, সবার শালীনতা রক্ষা এবং মানহানি ও আদালত অবমাননা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী বাক্-স্বাধীনতা মানে যা খুশি বলা বা লেখার স্বাধীনতনা মোটেও নয়; তা সে সনাতন মিডিয়াতেই হোক বা আধুনিক সোশ্যাল মিডিয়া।

বাক্-স্বাধীনতার প্রসারে সোশ্যাল মিডিয়ার সীমাবদ্ধতা ও গুরুত্ব: বর্তমান ভারতে সোশ্যাল মিডিয়াগুলি যেভাবে তৎপরতার সাথে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে তাতে আগামী দিনে বাক্-স্বাধীনতার পরিসর অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে, এটা নিশ্চিত। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার দৌলতে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় নাগরিকদের সাংবিধানিক সচেতনতা পোক্ত হয়নি এবং গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতাও হ্রাস পায়নি। বাক্-স্বাধীনতার সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ বা যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধগুলি সম্পর্কে অধিকাংশ নাগরিকই পরিচিত নয়। আবার যে ক্ষুদ্র অংশ সেগুলি সম্পর্কে পরিচিত তাদের একটা বড় অংশই সেগুলি সম্পর্কে অসচেতন। ফলে জনগণের এইসব অংশ কর্তৃক সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার সময় বাক্-স্বাধীনতার শর্তসমূহ ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়, পাশাপাশি ঘটে থাকে একে অপরের বাক্-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতার বশে। এইসব সমস্যার সূত্র ধরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বাক্-স্বাধীনতার নানান কুফলজনিত সমস্যাও তৈরি হয়। যেমন — ক) মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে পড়া; যা দাঙ্গা-হাঙ্গামার মতো পরিস্থিতির জন্ম দিতে ও দেশের মধ্যে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করতে সক্ষম। খ) সরকারি স্বার্থের অনুকূলে সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার তথা সরকারি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বিস্তার। গ) অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি পায়; যা পারস্পরিক ঘৃণার জন্ম দেয়। ঘ) মতামত প্রকাশের সময় অনেক ক্ষেত্রেই শালীনতা বা সদাচার লঙ্ঘিত হয়। যা কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের ভাবাবেগকে আঘাত করতে পারে। ঙ) সম্প্রদায়গত চেতনার বৃদ্ধি অনেক সময় বিচ্ছিন্নতার মনোভাবকে প্রাধান্য দিতে প্ররোচিত করে। চ) ধর্ম ও জাতিগত রক্ষণশীলতা এবং মৌলবাদী ভাবনাচিন্তার বহিঃপ্রকাশ ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ও দেশের মধ্যে বা বাইরে অস্থিরতা তৈরি করে। ছ) অনেক সময় সাজানো ঘটনার ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড হয়

এবং তা থেকে জাত-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি কেন্দ্রিক বিদ্বেষ, সামাজিক সংহতির নানান সমস্যার জন্ম হয়।

সর্বোপরি ব্যক্তি আক্রোশ অনেক সময় চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যার উদাহরণ অগ্রিমা জসুয়া, কুনাল কামরা প্রমুখ। সমালোচনা বা পাল্টা সমালোচনা কাম্য কিন্তু দৈহিক বা মানসিক হয়রানি কাম্য নয়। অপর একটি বৃহত্তর সমস্যার ক্ষেত্র হল সোশ্যাল মিডিয়া তথা বাক্-স্বাধীনতায় সরকারের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ'জনিত নিয়ন্ত্রণগুলি সাংবিধানিক ঠিকই কিন্তু অনেক সময়েই সরকার এগুলির অপব্যবহার করে সরকারি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে। এর সম্ভাবনা তখনই একমাত্র তৈরি হয় যখন সরকারের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত হয়। সরকারের কাজের সমালোচনা গণতন্ত্রে অত্যন্ত স্বাভাবিক; কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী সরকার যদি সহনশীল না হয় তাহলেই সমস্যা। সরকারের নিকট থেকে নেমে আসে ব্যক্তি-আক্রমণ, ফলে বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারের এই আচরণ অতীব নিন্দনীয় ও ভয়ঙ্কর।

সমস্যার ক্ষেত্রগুলি গুরুতর হলেও সোশ্যাল মিডিয়ার সুফল, গুরুত্ব ও সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল।

সোশ্যাল মিডিয়ার সুফল বা সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি হল: ক) সোশ্যাল মিডিয়া রাজনৈতিক পরিবর্তন আনতে পারে। ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সরকারের পরিবর্তনের 'হাওয়া' সোশাল মিডিয়া বহন করছে। খ) প্রতিষ্ঠিত সরকার আসন্ন নির্বাচনে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ধরে রাখার তাগিদেও সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজনৈতিক প্রচারকে জোর দিচ্ছে। অর্থাৎ শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহৃত হচ্ছে। গ) সোশ্যাল মিডিয়া শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতেও কাজ করছে। ঘ) গঠনমূলক ভাবনাচিন্তার প্রচার সামাজিক পরিবর্তন বা সামাজিক সুস্থিরতা উভয়ই বজায় রাখতে সাহায্য করছে ও কুসংস্কারমুক্ত সমাজের আদর্শ ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সমৃদ্ধ হচ্ছে। ঙ) সামাজিক অসমতার, অস্পৃশ্যতার ক্ষেত্রগুলি দূরীভূত হচ্ছে ও ব্যক্তির মানসিক প্রগতি ভূমিকা রাখছে। চ) তথ্যের প্রাচুর্য সোশ্যাল মিডিয়ার ভবিষ্যতকে ক্রমশ উজ্জ্বল করে তুলছে। মানুষ ইন্টারনেটে যে কোনও বিষয়েই অতি সহজে তথ্য পেয়ে যাচ্ছে ফলে অনেক কাজই দ্রুত উপলব্ধ হচ্ছে ও মানুষের জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছ) ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যের সত্যতাও যাচাই করা সহজেই সম্ভব হচ্ছে। জ) সর্বোপরি শিক্ষা তথা পঠনপাঠন ও গবেষণামূলক কাজকর্মও সোশ্যাল মিডিয়ার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করছে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও ইউটিউবের মাধ্যমে একজন শিক্ষক সহজেই তাঁর নিজ ছাত্রছাত্রীসহ এক বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, দর্শক, শ্রোতা ও পাঠকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে অতি দ্রুত।

উপসংহার : ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বে বর্তমান সংযোজন হল একক ব্যক্তির সাথে একক ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। বাক্-স্বাধীনতা নাগরিকদের অন্যতম একটি ব্যক্তিস্বাধীনতা। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা সবার জন্যই ক্ষতিকর। কাজেই যে কোনও ধরনের স্বাধীনতার উপরেই নিয়ন্ত্রণ জরুরি। না হলে অরাজকতা, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা প্রশ্রয় পাবে। তাই ব্যক্তি-মানুষের বাক্-স্বাধীনতার উপর সাংবিধানিক 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ'গুলি যুক্তিযুক্ত। এর দ্বারা বাক্-স্বাধীনতা সুরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নিয়ন্ত্রণ সোশ্যাল মিডিয়ার উৎকর্ষ বৃদ্ধিতেও সহায়ক হবে। সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহারও কম হবে। তবে বাক্-স্বাধীনতা তথা সোশ্যাল মিডিয়ার উপর বেআইনি নজরদারিও কাম্য নয়। ব্যক্তিসমূহের আচরণ ও সরকারের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাও নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। পাশাপাশি ব্যক্তি যাতে তার নিজস্ব মতামত প্রকাশে প্রতিপক্ষের নিকট থেকে কোনও বাধা না পায় সেই পরিবেশও সরকারকেই ফিরিয়ে আনতে হবে। অগ্রিমা বা কুনালের হয়রানির ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি আমরা চাই না। আমরা চাই সরকারি অন্যায় আইনের প্রতিবাদে যাঁরা মুখ খুলছেন না তাদের জন্য ভয়মুক্ত পরিবেশ। আসলে বাক্-স্বাধীনতা রক্ষায় সরকারের অনিচ্ছা রয়েছে, রয়েছে আইনের শাসনের ঘাটতি তাই ব্যক্তি পর্যাপ্ত সুরক্ষা পাচ্ছে না। তালিবানি নিয়ম প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চলে না, এটা আমাদের ভুললে চলবে না। আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলে বাক্-স্বাধীনতা, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণ ও সরকারের প্রভাব সবই তার সুনির্দিষ্ট পথ তথা লক্ষ্যে পরিচালিত হতে পারে। এ ব্যাপারে বিচারব্যবস্থা ও আইনের শাসনের ইতিবাচক ভূমিকা অবশ্যই প্রত্যাশিত।

সহযোগী গ্রন্থ ও তথ্যসূত্র :

১।https://duexpress.in>Editorial AGRIMA JOSHUA
২।www.ndtv.com>bengali> KUNAL KAMRA
৩। Kietzmanm, Jan H; Kristopher Hermkens (2011), 'Social media? Get Serious! Understanding the

functional building blocks of social media' & Obar, Jonathan A; Wildman, Steve (2015) 'Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue'. Link- https://en.m.wikipedia.org/wiki/social-media

৪। Maya E. Dollarhide; social media definition; Sep 6,2020,Investopedia;Link- https://www.investopedia.com/terms/s/social-media

৫। Social Media; Wikipedia; Link- https://en.m.wikipedia.org/wiki/social-media

৬। Social Media; Investopedia. Link- https://www.investopedia.com/terms/s/social-media

৭। Joshi, GN; The Constitution of India, The Macmillan Company of India, New Delhi, 1975, page- 58.

উমা

জলঙ্গী নদীতীরে ইটভাটা

অলোককুমার বিশ্বাস

ইট মানেই নগর সভ্যতার প্রথম সোপান বা ক্ষুদ্র একক। ইট বিহনে আধুনিক থেকে অত্যাধুনিক জীবনযাত্রা ভাবনার অতীত। আবার ইঁট মানেই একমুঠো দূষণ। ইট মানে এক টুকরো মাটি, কয়েক ফোঁটা জল আর কিছু জ্বালানি। এক টুকরো মাটি থেকে একবার ইট তৈরি হলেই ব্যাস আর কোনও দিন সে তার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। যেখানে ইটের উৎপাদন সেখানেই দূষণের ঘনঘটা। আর আমাদের জীবনের, আমাদের জীবিকার, আমাদের ভালবাসার নদীর হারিয়ে যাওয়ার কাহিনী।

ভালো ইট, ভালো পলি— এই চরম সত্য যেন তাদের মর্মবাণী। তাই গড়ে ওঠে বৈধ এবং অবৈধ ইট তৈরির ভাটা। ভাটা গড়তেই খুঁজে নেওয়া হয় নদীকে। সে যে নদীই হোক না কেন। এই আলোচনার সূত্রপাত এক সময়ের খরস্রোতা, কাচ-স্বচ্ছ জল আর রুপোলি চকচকে সাদা বালির নদী জলঙ্গীকে নিয়ে।

'জলঙ্গী' ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাওয়া এক মৃতপ্রায় নদী। কবে এর জন্ম সেই অতীত না ঘেঁটে কবে থেকে সে মৃত্যুর দিকে ধাবিত দচ্ছে সে প্রসঙ্গে যদি আলোচনা করা যায় তবে মূল বিষয়টিকে শেষ করা যাবে। ফারাক্কা বাঁধ তৈরি এবং জলের প্রবাহকে আটকে গঙ্গা-পদ্মার প্রাকৃতিক জল পাবার আশা চিরতরে বন্ধ হল জলঙ্গীর। নদীর উৎস মুখ যদি বন্ধ হয় তবে তার প্রবাহ বন্ধ হবে এটাই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে জলঙ্গীর প্রাপ্তি হল জলঙ্গীর তীরে গড়ে ওঠা শহর ও শহরতলির পয়ঃপ্রণালীর নোংরা দূষিত জল। সবুজ বিপ্লবের বদান্যতায় উন্নত ফসল ফলাবার জন্য কৃত্রিম রাসায়নিক সার, কীটনাশকের ব্যবহার, সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত জলের উৎস হিসাবে নদীর জলকে ব্যবহার করার ফলে 'জল লুঠ' চলছে হরির লুটের মতো।

'জলঙ্গী' তুমি এখন কার? তুমি কি তোমার নিজের, না, মাটি মাফিয়াদের? আসলে তুমি এখন তোমার নিজেরও না, কারণ তোমার সেই কৌলীন্য এখন আর নেই, তুমি এখন শুধু তাদের যারা তোমাকে জোর করে দখল করতে পারে। জোর (অবৈধ) কাদের? যারা মাফিয়া, তাদের। জলঙ্গী এখন মাটি মাফিয়াদের দখলে। রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে, ঠিক সেই জীবনানন্দের কবিতার মতো— মেঠো ইঁদুরকে যেমন রাতের কালো অন্ধকারেও প্যাঁচা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় ঠিক সেইরকম— লোকচক্ষুর অন্তরালে মাটি (পলি) মাফিয়ারা নদীপথে নৌকায় করে বা অন্যান্য যানবাহনে করে দূরদূরান্তের ইঁটভাটায় পৌঁছে দেয় পলি — ভালো ইঁট হবে বলে। এতে নীদর কি হবে তাতে মাফিয়াদের কিছু যায়-আসে না। চাই টাকা।

নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় ২০০০ সালের ভয়ঙ্কর বন্যার সময় জলঙ্গীর বুকে ঘোলা জলের প্রবাহ সব কিছুকে ধুয়ে নিয়ে যায়। বহু সম্পদ নষ্ট হয়। তবু মাটি চোরদের কোথায় যেন একটা খেদ থেকে গিয়েছিল— নদীর ঘোলা জলেও নাকি পর্যাপ্ত পলি ছিল না। ২০০০ সালের বন্যায় জলঙ্গী বাহিত পলিও অদম্য চাহিদাসর্বস্ব মাটি মাফিয়াদের তুষ্ট করতে পারে নি। তাদের চাহিদা ছিল জলঙ্গীর চর বা নদীপাড়ের পলিমিশ্রিত মাটি। জলঙ্গীর পাড়ে ভুঁইফোঁড়ের মতো ছোট-মাঝারি-বড় মাপের হরেক

রকম ইটভাটার জন্ম হয়েছে। সেই পলিমাটি জোগান দিতে মায়ের মতো জলঙ্গী নদীকে নিঃস্ব হতে হচ্ছে। জলঙ্গীর কোথা দিয়ে জল ঢুকবে, কোথায় তা ঘুরপাক খাবে, কোথায় জল স্থিত হয়ে তার পলি বিমোচন করে মালিকপক্ষের গণিশবাবুকে চাঙ্গা রাখবে, এইরকমই সূক্ষ্ম হিসাব করে মাটি মাফিয়াদের চলতে হয়। শুধু ইটভাটা নয়, টালিভাটার ক্ষেত্রেও একইরকম অবস্থা।

মাটি মানেই ইটের মাটি নয়। তার নিজস্ব জাত-কুল থাকতে হবে অর্থাৎ পলি হতে হবে। দো-আঁশ বা বেলে দোঁ-আঁশ হলে তবেই হবে গুণমানধারী ইট। অন্য মাটি নৈব-নৈব চ। ইঁট তৈরিতে প্রচুর জল দরকার। সেই জলও দেয় জলঙ্গী নদী। বড় রকমের ইনভেস্টমেন্ট হলেই ইঁটভাটা সম্ভব। সেই সঙ্গে থাকতে হবে, কিছু লম্বা লম্বা হাত। যে হাত সেখানে অনায়াসে পৌঁছে যাবে যেখানে কোনরকম বাধা থাকবে না। ব্যাস তাহলেই পলির ব্যবসা, মাটির ব্যবসা, জলের ব্যবসা, ইটের ব্যবসা গড়গড়িয়ে চলবে।

জলঙ্গীর তীরে ইটভাটার বেশ বাড়বাড়ন্ত। কারণ 'লাগে মাটি দেবে নদী'। যদিও এই ধারণার কিছুটা হয়ত পরিবর্তন ঘটেছে। এখন অবশ্য সবচেয়ে বেশি চাহিদা টপ সয়েল বা জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি, অথবা নদী-পুকুর, খাল-বিল, বাঁওড়, খাঁড়ি, হাওড় কিংবা চড়াঞ্চল সংস্কার মাটি। এই সব কাজ শুরু হলেই পিঁপড়ের গন্ধ শুঁকে খাবারের কাছে পৌঁছে যাবার মতো মাটি মাফিয়ারা ঠিক পৌঁছে যায় সেখানে মাটি সংগ্রহ করতে।

ইটভাটা মানেই নদীতীর নয়। সরকার বাহাদুর ইটভাটার জন্য বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে নির্দিষ্ট করেছে, সেই সঙ্গে কিছু শর্তও চাপিয়ে দিয়েছে। যেমন— ইটভাটা প্রস্তাবিত জায়গাটি দু'তিন ফসলি কৃষিজমি হলে হবে না, ফলের বাগান থাকলে হবে না। সেই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, রেল লাইনের পাশে বা লোকালয় থাকলেও কোনমতেই ইটভাটা করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলছে। কোথায় কিভাবে ইটভাটা হবে তা শুধু আইনের খাতায় লেখা কিছু শর্তের উপর নির্ভর করে না। এখানেই শুরু হয় তিনপাত্তি খেলার মতো লুকোচুরি। ইটভাটার কিছু আর্থিক ও পরিবেশগত শর্ত অনুসরণ করতে হয় ইটভাটার মালককে। শর্ত হল— ইটভাটা করা যেতেই পারে। কিন্তু কিছুটা হলেও আইনকানুন তো মানতে হবে। তাই ইটভাটা যদি ছোট হয় তবে সরকার বাহাদুরকে রয়ালটি বাবদ প্রতি বছর ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আর একটু বড় ভাটার জন্য ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা থেকে আড়াই লক্ষ টাকা দিতে হয়। অবশ্য এখানে ছোট এবং বড় ভাটা বলতে ঠিক তার মাপকাঠি কি সে ব্যাপারে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। প্রশ্ন যাই থাক, ভাটা ছোট না বড় সে মাপকাঠিও পরিবর্তিত হতে পারে। আগেই বলা হয়েছে লম্বা হাত থাকা জরুরি। যাই হোক রয়্যালটি বাবদ প্রদেয় অর্থ ছাড়াও সেসব বাবদ নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা। তাই সরকারের আয় বাবদ খুব একটা কম হবার কথা নয় যদি সব ঠিক থাকে। এখন প্রশ্ন হল ঠিক থাকার। পরিবেশ দপ্তর তার শর্ত অনুসারে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে নেবে এবং তারপর ইটভাটা মালিকের ভাটা গড়ার ছাড়পত্র পাবার কথা। উভয় পক্ষই শর্ত পালন করে। কেউ কিছুটা ছাড় দিয়ে, কেউ কিছুটা ধরে নিয়ে। এই ছাড়া-ধরার খেলায় সাধারণের সমস্যা বাড়ে বৈ কমে না। কারণ নিয়মকানুন কাগজে কলমে থাকলেও ইটভাটার জন্য জল, স্থল, বায়ুর দূষণ বেড়েই চলেছে।

জলঙ্গী নদীর দূষণ মানেই সমাজের প্রতিটি স্তরে অসুখ, দূষণ, রোগ-ভোগ, ভোগান্তির ওপর লাভ করাটাই ওদের দস্তুর। কিন্তু বৈধ হোক বা অবৈধ, জলঙ্গীর পাড়ে বা নদী থেকে দূরে অজ পাড়াগাঁয়ে হোক, ইটভাটার জন্য চাই মহার্ঘ মাটি, যা খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি ...। তাই সোনার চেয়েও খাঁটি যখন মাটি, তাই তাকে অধিকারের প্রচেষ্টার কোনও কসুর কেনই বা ইটভাটার মালিকপক্ষ করবে?

ইটভাটার সংখ্যাগত চিত্র এইরকম— নদীয়া জেলার ডিস্ট্রিক্ট ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মেশন দপ্তরের থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোট ৫২৪টি ইটভাটা আছে। এর মধ্যে ৪০২টি বৈধ। অর্থাৎ সরকারি হিসাব মোতাবেক এই জেলায় ১২২টি ইটভাটা অবৈধ।

নদীয়া জেলায় ইটভাটার সংখ্যাগত পরিসংখ্যান— যেগুলি জলঙ্গী নদীর পার্শ্ববর্তী—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	ইটভাটার সংখ্যা
১.	করিমপুর	০
২.	তেহট্ট	৪
৩.	নাকাশিপাড়া	৩
৪.	চাপড়া	৮
৫.	কৃষ্ণনগর-১	৫
৬.	কৃষ্ণনগর-২	৪
৭.	নবদ্বীপ	০

পরিসংখ্যান অনুযায়ী জলঙ্গী পাড়ে শুধুমাত্র নদীয়া জেলায় ২৪টি বৈধ ইটভাটা আছে। অবৈধর প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল ইটভাটার চিমনি নির্গত ধোঁয়া, ভাটায় কাজ করা শত শত

শ্রমিকের প্রতিদিনের প্রাতঃকৃত্যের ক্রিয়াকলাপও জলঙ্গী তীরেই চলে। তাই জলঙ্গী নদীর দূষণজনিত অসুখের মাত্রা থেকেই যায়।

ইট তৈরির প্রযুক্তিগত কিছু পরিবর্তন ঘটেছে— আগে খাল-বিল ও নদ-নদী থেকে সরাসরি জল নিয়ে হাত বা পা দিয়ে ঘষে কাঁকড় বেছে মাটি তৈরি হত। এখন লোহার মেশিনে মাটি ফেলে গরুকে দিয়ে কলুর ঘানির মতো ঘুরিয়ে মাটি তৈরি হয়। এখন ডিজেল বা কেরোসিন দিয়ে মেশিন চালিয়ে, কাঠের ছাঁচে ফেলে ইট তৈরি হয়। মোটামুটি হিসেব হল— এক ঘনফুট মাটি থেকে মাত্র ৯ বা ১০টি ইট তৈরি হয়। যদিও ইটের মাপের স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। বর্তমানে নগর সভ্যতার প্রকোপ যেভাবে বাড়ছে, এমনকি গ্রাম বাংলায়ও যেভাবে ইটের ইমারত তৈরি হচ্ছে তাতে কত ঘনফুট মাটি ব্যবহার হচ্ছে আর কত ইট তৈরি হচ্ছে তার হিসাব কেউ রাখছে কি? অবশ্য কেউ না রাখলেও নদী কিন্তু রাখছে। সময় হলে নদীই বুঝিয়ে দেবে, নদী চর, নদী পাড় কেটে ইট তৈরির হিসাব।

ইটভাটার মালিকপক্ষকে শুধু লাভের অংশ দেখলে হবে না। কত রকম আর্থিক প্রদানের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে হয়— তা-ও কম নয়। সরকারকে মাটির জন্য প্রদেয় কর, পরিবেশ দপ্তরের কর, নয়া জিএসটি কর ইত্যাদি। এর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের বায়নাক্কা তো আছেই। এমন পরিস্থিতিতে ভাটা মালিকপক্ষকে ব্যবসা চালু রাখতে নাভিশ্বাস অবস্থা। আবার এমন অবস্থাও নয় যে মালিকপক্ষ তাদের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থা করছে। কারণ এখানে আছে বিপুল মুনাফার হাতছানি। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, এদের না আছে অবসরকালীন ভাতা বা গ্রুপ ইনস্যুরেন্স অথবা দুর্ঘটনাজনিত বিমার সুযোগ-সুবিধা। শ্রমিক হয়েও শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা মালিক ভোগ করছে। এদিকেও লাভের অঙ্কের কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী।

এখন প্রশ্ন হল — সমাজের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা হল গৃহ। এই গৃহের দীর্ঘস্থায়ীকরণে মানুষ অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই যদি অবিলম্বে বিজ্ঞানীরা উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে দূষণমুক্ত ইটভাটাকে শৈল্পিক চরিত্র দান করে তবেই মঙ্গল। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের 'ফ্লাইং অ্যাস' দিয়ে কিছু ইঁট তৈরি হচ্ছে। সেই সঙ্গে আধুনিক উপায়ে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত ভেতরে ফাঁপা অথচ মজবুত কংক্রিট কমপ্রেসড ব্লক ইঁট, এই ধরনের ইঁট ফ্ল্যাট তৈরিতে কাজেও লাগছে। যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করা যায় তবে হয়ত জলঙ্গীর মতো বহু নদী বাঁচবে। প্রকৃতি সুন্দর হবে। অন্যথায় মাল্টি-ন্যাশনাল কর্পোরেট সেক্টরের আর্থিক সহায়তায় আমাদের নদীগুলোকে দিনের পর দিন অস্তিত্বহীন করে দেবে মাটি মাফিয়ারা।

তথ্য সূত্র: নদীয়া জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। উমা

---

৩২ পাতার পর

ঘুরছে আর আকাশ পশ্চিমে সরছে। আর যদি এই ব্যবস্থাও পছন্দ না হয় তবে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করুন তেনারাই আপনাকে সন্ধ্যের আকাশে দেখা দেবেন।

এতক্ষণ ধরে যদি ধৈর্য ধরে কেউ লেখাটা পড়ে থাকেন হয়ত এবার তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। মনে হতেই পারে, লেখক তো আচ্ছা লোক মশাই, নিজে খানিকটা চেনেন আর গড়গড় করে সেটা বলে গেলেন, যিনি প্রথমবারের জন্য দেখছেন তাঁর কি হবে? সত্যিই তো, খুব ভুল হয়ে গেছে, নিজগুণে ক্ষমা করবেন। তবে ঐ যে বলছিলাম আকাশের মানচিত্র, যাকে আমরা বলি Star Chart, সেটা জোগাড় করে নিতে পারেন। তারপর দেখার পদ্ধতি জেনে নিলেই আকাশ ফতে! আর যদি অন্য রাস্তা বলেন তবে বলতে পারি আমাদের প্রায় সবার কাছেই এখন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন রয়েছে, তাতে SK-eye, Sky view, Stellarium ইত্যাদি অ্যাপ-এর সাহায্যে আকাশ দেখতে পারেন। অ্যাপটি চালু করে নিয়ে আকাশের দিকে মোবাইল তাক করলেই, আপনার বলে দেওয়া অবস্থান অনুযায়ী, সেটি আপনাকে একের পর এক তারা আর তারামণ্ডল চিনিয়ে দেবে— ব্যাস্, আশা করি সমস্যার সমাধান পাওয়া গেল।

এখনো তো কত কথাই বাকি রয়ে গেল। আসলে জানিই বা কতটুকু। রাতের বেলা এক আকাশ তারা মাথায় নিয়ে নিষ্পলক চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকার যে অনুভূতি তা হয়ত অবর্ণনীয়। নিজে একবার যদি দেখেন তাহলেই অনুভব করতে পারবেন ব্যাপারটা। আশা করি, সকলে একবার আকাশের দিকে তাকাবেন এবং দেখার চোখ নিয়ে তাকাবেন। ঐ নিকষ কালো অন্ধকারের বুক চিরে কোনো জ্যোতিষ্ক যে আপনার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবে না তা কেই বা বলতে পারে। তাই বিস্ময়ের শেষ নেই, চেনা আকাশের দিকেও তাই নতুন জিজ্ঞাসা নিয়ে বারেবারে চেয়ে থাকি, বারেবারে ফিরে যাই তারায় ভরা এক অন্ধকার আকাশের নীচে। উমা

যৌনকর্মীবন্ধু স্মরজিৎ জানা (১৯৫২-২০২১)

স্মরজিৎদা তোমার গ্রীনপার্টি গড়ার স্বপ্নটা অধরাই রয়ে গেল। কোভিড নিয়ন্ত্রণে দেশের ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের সদস্য, ডা. স্মরজিৎ জানা, ৮ মে সকাল ১০টায় সবার অলক্ষ্যে কোভিড মৃত্যুমিছিলে হারিয়ে গেল। এটা মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে আমাদের। তোমার মৃত্যু এতটাই আকস্মিক যে দেহদানও করা হল না তোমার। তাহলে হয়ত প্যাথলজিকাল অটোপ্সির (রোগনির্ণায়ক ময়না তদন্ত) পর মৃত্যুর সঠিক কারণটা জানা যেত। ছদিন ধরে জ্বর তবুও দুর্বারের কাজ চালিয়ে গেছ তুমি। বড় দেরি করে তুমি হাসপাতালে ভর্তি হলে।

সেই ৮০-র দশকের গোড়া থেকে তোমাকে দেখছি। বোধহয় ১৯৮১ সালে পকাইদার (প্রদীপ দত্ত) সঙ্গে পিজি হাসপাতালের হোস্টেল থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিটের উৎস মানুষের ঘরে এসেছিলে তুমি। ভালো লেখ। তাই উৎস মানুষের ঠেকে তোমার ঠাঁই হল। তুমি চিরদিনের জন্য 'উৎস মানুষ-এর লোক' হয়ে গেলে। সেই সময় তুমি আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা ভুল ধারণার বিরুদ্ধে কলম ধরেছ। স্বাস্থ্য, চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক লেখক হিসেবে পশ্চিমবাংলার গণবিজ্ঞান সচেতন মানুষের মধ্যে তুমি তখন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলে। একদিন নিবারণ সাহার উৎস মানুষ বাঁধাই ঘরে এক বন্ধু এসে জানাল শিয়ালদহ লোকালে সে শুনে এসেছে যে এক হকার বই ফেরি করছে আর বলছেন—'ডা. জেনার (জানা) বলেছেন দাঁতের কোনও পোকা হয় না।' সে কথা শুনে বিজ্ঞানকর্মী হিসেবে আমাদের কৌতূহল এবং উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

তখন তুমি উৎস মানুষ পত্রিকাতে তো লিখছ-ই, গণবিজ্ঞান ও গণ-স্বাস্থ্য বিষয়কে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে সেই সময়ের প্রায় সব পত্রিকাতেই তুমি কলম ধরেছ। ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম, ড্রাগ ডিজিজ ডক্টর, সোশ্যালিস্ট হেলথ্ রিভিউ, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী, প্রগতি বার্তা, ফ্রন্টিয়ার— প্রায় কোনও পত্রিকাই বাদ যায় নি। পরে সেই সব লেখা বুকলেট এবং সংকলন হিসেবে বাংলার বহু ঘরে পৌঁছেছে।

তুমি ডাক্তার। কমিউনিটি মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ, এপিডেমিওলজিস্ট। গণস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মী হিসেবে তোমার সান্নিধ্যে এসে আমরা তখনই জেনেছি— স্বাস্থ্য কেবল ভালো হাসপাতাল-ট্যাবলেট-ইঞ্জেকশন নয়, স্বাস্থ্য হচ্ছে খাদ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, মানবাধিকার। সেই অর্থে ডাক্তার একজন রাজনৈতিক কর্মী। স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে একসঙ্গে আমরা দেশের কত বিচিত্র জায়গায়ই না গেছি— গণবিজ্ঞান পদযাত্রায় বর্দ্ধমানের গ্রামে গ্রামে, ভোপাল গ্যাসকাণ্ডের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানার ডিটক্সিফিকেশন স্বাস্থ্য-শিবিরে চিকিৎসা করতে, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ডের পাহাড় ও জঙ্গলে আসাম রাইফেলসের মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করতে, মধ্যপ্রদেশ আর বিহারের কয়লাখনি লাগোয়া গ্রামগুলিতে মানুষের শরীরে কয়লার বিষের চিহ্ন খুঁজতে। সেই সব প্রমাণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আইনের লড়াইয়ে হাতিয়ার হয়েছে। তোমার কাছে এগুলোই ছিল ডাক্তারি। তুমি আর তোমার সম-মনোভাবাপন্ন বন্ধুরা সবসময় চেষ্টা চালিয়ে গেছ স্বাস্থ্য আন্দোলনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিকটা মানুষের সামনে তুলে ধরতে।

পরমাণু শক্তির বিরুদ্ধেও তুমি লিখেছ জোরদারভাবে। সেফ এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর পাতায় পরমাণু শক্তির ধাপ্পা মানুষের সামনে ফাঁস করে দিয়েছ।

পুনের ভীম কোরেগাঁও মামলার জেলে বন্দি সমাজকর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের মুক্ত করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছ তুমি। ছত্তিশগড়ে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সোমি সোরির মুক্তির জন্য সভা, প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত করেছ।

শুরু করেছিলে বিজ্ঞানচেতনা প্রসারে ব্রতী এবং পরমাণুশক্তি বিরোধী পপুলার লেখক এবং সংগঠক হিসেবে। পরিণত বয়সে পরিবেশবাদী সংগঠকই হয়ে উঠেছিলে সমাজ বদলের কর্মী।

'সোনাগাছি মডেল'— বিশ্ব জুড়ে এডস্ প্রতিরোধে পথ দেখানোর মূলে তুমি, ডা. স্মরজিৎ জানা। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের নেতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছ তোমার বৈপ্লবিক চিন্তার জন্য। ৮০-৯০-এর দশকে এডস্ অতিমারীর সংক্রমণ ঘটছিল যৌনরস আর সংক্রমণের মাধ্যমে। বিশ্ব এডস্ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম হিসেবে কলকাতায় তৈরি হয় 'সোনাগাছি প্রজেক্ট'। সোনাগাছি এশিয়ার বৃহত্তম যৌনবৃত্তির কেন্দ্র। সেই প্রজেক্টের দায়িত্ব তোমার ওপর বর্তায়। উৎস মানুষে থাকাকালীন সোনাগাছির জীবন সম্বন্ধে তোমার কিছুটা পরিচয় হয়, সেখানকার মানুষের অধিকার নিয়ে আলোচনা হত উৎস মানুষ-এ। হাতে-কলমে সেই সব ভাবনাকেই কাজে লাগানোর সুযোগ এল এখন। তোমার বৈপ্লবিক শ্লোগান 'গতর খাটিয়ে খাই, শ্রমিকের

অধিকার চাই'-এর মধ্যে দিয়েই অবমাননাকর 'বেশ্যা' হয়ে উঠল 'যৌনকর্মী'। নৈতিক ব্যাধি এডস্ হয়ে গেল এক পেশাগত রোগ। যৌনকর্মীদের আঙিনার বাইরেও সামাজিক অসাম্যের কাঠামোকে প্রশ্ন করার জন্য জন্ম নিল 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি'। যৌনকর্মীদের চিকিৎসাকামী বিপন্ন মানুষ হিসাবে না দেখে তাদের এই প্রকল্পের অংশীদার করে নিলে তুমি। প্রকৃত অর্থেই দুর্বার গতি পেল সেই আন্দোলন। 'দুর্বার' পশ্চিমবঙ্গের ৬৫,০০০ মহিলা, পুরুষ ও ট্রান্সজেন্ডারদের সংগঠন। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মহিলা, শিশু— এই প্রতিটি অংশকে নিয়ে কাজ করে দুর্বার। এই কাজ করতে গিয়ে একে একে জন্ম নিল 'ঊষা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি'। যৌনকর্মীদের ছেলেমেয়েদের জন্য 'রাহুল বিদ্যানিকেতন' ও 'দুর্বার স্পোর্টস একাডেমি', সাংস্কৃতিক সংগঠন 'কোমল গান্ধার', সোনাগাছির যৌনকর্মীদের ছেলেমেয়েদের সংগঠন 'আমরা পদাতিক'। নিজেদের রোজগার সুরক্ষিত করার জন্য ১৯৯৫ সালে ৩০,০০০ টাকা আর ১৩ জন সদস্য নিয়ে গড়ে উঠল ব্যাঙ্ক 'ঊষা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড'। দু'বছরের মধ্যেই 'ঊষা'র সদস্য সংখ্যা বেড়ে হল ৩০,০০০।

সোনাগাছিতে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ শুরু করতে চেয়েছিলে তুমি। চার দশক আগেই 'মানস'-এর সদস্যপদ তুমি গ্রহণ করেছিলে। ছোটভাই পিন্টু-র মানসিক অসুস্থতা কি তোমাকে মানসিক স্বস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছিল, নাকি 'মানসিক স্বাস্থ্য' জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলেও এ বিষয়ে তোমার আগ্রহ ছিল। গত মানসমেলায়, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে তুমি যে বক্তব্য রেখেছিলে সেটা একটা মানসিক স্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখার মুখবন্ধ। এ বিষয়ে আমাদের পরে বিশদ আলোচনার কথা ছিল, হল না।

মনে আছে, এথেন্সের সেই লেবু এনে তার বীজ থেকে চারা বানিয়ে মানস-এ দিয়েছিলে? সেটা সজীব হয়ে মানস-এ বাড়ছে। তোমার বাড়ি উপচে-পড়া গাছের যে দঙ্গল তাদের যত্নের দায়িত্ব কাদের দিয়ে গেলে তুমি? সমাজ বদলের জন্য একটা অন্য স্বপ্ন দেখতে তুমি— অনেকটা গ্রীন পার্টির মতো।

মেদিনীপুরের বহলিয়া গ্রামের স্মরজিৎ জানার মতো আর কেউ কি এই মুহূর্তে জন্ম নিল বাংলার কোনও গ্রামে? — **জ্যোতির্ময় সমাজদার**

উমা

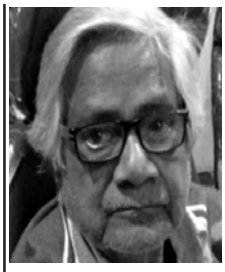

দেহদান ও ব্রজ রায়
১৯৩৬-২০২১

ব্রজ রায় তখন বিবাদি বাগে অক্টাভিয়াস বিল্ডিংয়ে কাজ করতেন। বলতেন 'বাবুর বাড়ির কাজ'। সেটা ১৯৮৪। মাঝে মাঝে পাশের বাড়িতে, অর্থাৎ আমি যে সংস্থায় চাকরি করতাম, আড্ডা মারতে আসতেন। আমি ছাড়াও ওঁর আরো জনা দুয়েক পরিচিত ঐ একই দপ্তরে ছিলেন। ১৯৮৪-র ডিসেম্বরে ব্রজ রায় (দা) একদিন এসেই জিজ্ঞাসা করলেন 'আপনার কি মনে হয়, এ বছর দেশের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী?' আমি তো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললাম এসব কি ছেলেমানুষি প্রশ্ন করছেন? ব্রজদা নাছোড়বান্দা। কেন, ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড। ব্রজদা বেশ অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, না, তা নয়। তবে? কেন এই কদিন আগে (২ ডিসেম্বর) ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় যে গ্যাস দুর্ঘটনায় হাজার তিনেক মানুষ মারা গেলেন, প্রায় ৫০ হাজার মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আপনার তা মনে এল না? এই ছিলেন ব্রজদা। ব্যতিক্রমী চিন্তার মানুষ। বোধহয় পরের বছরেই, ব্রজদা তখন এপিডিআর-এর কাজে অনেকটা সময় দিতেন। ওঁরই উদ্যোগে লঞ্চে সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়া হল। সুবোধ দাসগুপ্ত, বীরেন রায়, অমিয়া রায়চৌধুরী সেই ট্যুরে গিয়েছিলেন। ব্রজদা 'ম্যানেজার'। মনে পড়ে ঐসব প্রবীণ মানুষরা কোনো কিছু এদিক ওদিক হলেই বলতেন 'এই ব্রজ এসব কি হচ্ছে'? ব্রজদা হেঁসেল সামলাবেন না বয়স্কদের কথা শুনবেন তা নিয়ে ঘেমে যেতেন। আমরা সহযাত্রীরা তা দেখে বেশ মজা পেতাম।

ব্রজদা চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠন খ্যাত অনন্ত সিংহর সহযোগী ছিলেন। মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি করে বলতেন 'আমি তো ডাকাত'। ১৯৯০ থেকেই একটা নতুন কিছু করা চাই এই ভাবনাটা ব্রজদাকে অস্থির করে তুলেছিল। ডাক্তার ভাস্কর রায়চৌধুরী, ডাক্তার পীযূষকান্তি সরকার তাঁদের সাহচর্যে 'গণদর্পণ' গড়ে তোলেন। সঙ্গে চন্দনের মতো কয়েকজন তরুণ সঙ্গীকে পেয়েছিলেন। শুরুতেই গণদর্পণ নিয়ে মানুষের কৌতূহল দেখা যায়। মরণোত্তর দেহদান ও অঙ্গদান নিয়ে আন্দোলন শুরু হল। ব্রজ রায় আর সব কাজ থেকে নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে নিয়ে আন্দোলনটা ছড়িয়ে দেবার কাজে মন দিলেন। পরবর্তীতে ওটাই ছিল ওঁর ধ্যানজ্ঞান। গোড়ার দিকে গণদর্পণের 'অঙ্গীকারপত্রে' কিছু মানুষ মরণোত্তর দেহদানে সম্মতি দেন। তার ভেতর কিছু নামি মানুষও ছিলেন। ব্রজ রায় মাঝে মাঝেই বলতেন, 'জানেন অমুক সম্মতি দিলেন'। যদিও তাঁদের কয়েকজনের প্রয়াণের পর পরিবারের লোকেদের প্রবল আপত্তিতে প্রয়াত মানুষের শেষ ইচ্ছা পূরণ করা যায়নি। সেই সময় মাঝেমধ্যে রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে উৎস মানুষ দপ্তরে আসতেন। গণদর্পণের দেহদান-এর আবেদন উৎস মানুষে বেরোত। পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন

গণদর্পণের অঙ্গীকার পত্রে সম্মতি দেন।

১৯৯৮, তখনও গণদর্পণ সেভাবে সাড়া ফেলেনি, আমাদের পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত একজনের ভাইপো দুরারোগ্য রোগে মাত্র ৫ বছর বয়সে মারা গেল। পরিবার থেকে ঐ ছোট বাচ্চার দেহদান করার সিদ্ধান্ত ঐ সময়ে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উৎস মানুষ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই গণদর্পণের দেহদান অঙ্গীকার ফর্মে সই করেন। দেহদান কিভাবে করে, কী তার পদ্ধতি এসব নিয়ে বিশেষ ধারণাই ছিল না। পি জি হাসপাতালে সৌভিক সামন্ত-র মরদেহ রেখে ছুটলাম ব্রজদা-র বাড়ি। মূলত গণদর্পণের (পড়ুন ব্রজ রায়ের) ও উৎস মানুষ সম্পাদক প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে সৌভিকের দেহদান করা সম্ভব হয়েছিল। দেহদান প্রক্রিয়াতে যাতে কোনও অসুবিধে না হয় অ্যানাটমি বিভাগের তখনকার প্রধান ডাক্তার বরুণ মুখোপাধ্যায় সারাক্ষণ সেদিকে নজর রাখেন। দেশে মরণোত্তর দেহদান ও অঙ্গদান নিয়ে যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাতে ব্রজ রায়ের অবদান ভোলা যাবে না।

ব্রজ রায় যে কাজে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন তাঁর অনুগামীরা যে গণদর্পণ-এর আন্দোলনকে ধরে রাখতে পারবেন তা বোঝা যায় প্রয়াণের পর ব্রজ রায়ের দেহের রোগনির্ণয় ময়নাতদন্ত-এর ঘটনা থেকে। দেশে সম্ভবত প্রথম এই ঐতিহাসিক কাজটি হল যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে লেখা থাকবে। সেই সঙ্গে ব্রজ রায়ও ইতিহাসে ঠাঁই পেলেন।

উমা

মুক্তবুদ্ধির ছড়াকার অমিত চৌধুরী
(১৯৫৯-২০২১)

উৎস মানুষ পত্রিকায় গত তিনটি সংখ্যাতে ‘প্রযুক্তি পেরিয়ে, আঙুল নাড়িয়ে’ লেখাটির শিরোনাম অমিতের দেওয়া। বলেছিলেন এটা ধারাবাহিকভাবে চলবে। অমিতের প্রয়াণে সিরিজের তৃতীয় লেখাটির পর তাতে ছেদ পড়ল। ১৪ এপ্রিল ২০২১, হাসপাতালে ভর্তি হন। ৪মে চলে গেলেন। অমিত চৌধুরী প্রযুক্তিবিদ, নিবন্ধকার, ছড়াকার, খাদ্যরসিক— এক প্লেট চিকেন বিরিয়ানি খেলে যার মেজাজটা ফুরফুরে হয়ে উঠত। পছন্দের মানুষের সঙ্গে মোবাইলে টানা দেড় থেকে দু ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া ওঁর কাছে কোনো ব্যাপারই ছিল না। মাথায় নানান আইডিয়া গজগজ করত। কখনো যোগশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শঙ্কর গুহনিয়োগীর সাথে এক মাদুরে শোয়া। নিজে যেখান থেকে প্রযুক্তির পাঠ নিয়েছিলেন সেখানে পড়ানোর চাকরিতে যোগ দেবার চেষ্টা করেও অতীত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জেরে সেই চাকরি না-হওয়ার হতাশার কথা বলতেন। এমনকি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে খুটখাট মনোমালিন্য-র কথাও। ওঁর এক বিরল গুণ ছিল — বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। তা সে পুরনো বন্ধু, ইস্কুলের মাস্টারমশাই--- যিনিই হোন না কেন, একবার গেলেই হল। অমিতের কানে বলতে গর্ব বোধ করতেন। বাঁকুড়ার মানুষ ইদানিং চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর মাঝে মাঝেই বলতেন, শিকড়ের সন্ধান করতে করতে খুঁজে পেয়েছেন। অবশ্য কোনদিনই ছিন্নমূল ছিলেন না অমিত চৌধুরী। কালীঘাট পাড়ার ছেলে। পরে একেবারে উত্তরের বাসিন্দা হলেও বাঁকুড়াকে ভোলেননি। উৎস মানুষ নিয়ে বেশ আবেগ ছিল। পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহভাজন অমিত চৌধুরী উৎস মানুষ যে এখনও বেরোচ্ছে তাকে কখনও হেলাফেলা করতেন না। বলতেন এটা আপনারা যে চালিয়ে যাচ্ছেন তা প্রশংসনীয়। বিনা নোটিশে অমিত পত্রিকার জন্য ছড়া লিখে দিতেন। ওঁর প্রয়াণের মাস দেড়েক আগে অমিতের স্ত্রী মারা যান। কঠিন অসুখ সারার নয় তা জানতেন। নার্সিং হোমে চিকিৎসাধীন স্ত্রী, হোয়াটস অ্যাপে অমিত ছড়া পাঠালেন।

ঈশিতাকে

বয়স যখন তোর মাত্র কুড়ি।
ফুটল যখন, আমার প্রেমের কুঁড়ি।
আমার এখন পেরিয়ে যাওয়া ষাট।
প্রেমের সাক্ষী, হাসপাতালের খাট।
ঝুঁকির জীবন নানারকম...
যার যেখানে দম!
তেমন করেই বাঁচে মানুষ, দুয়ারে থাকে যম!!
বাঁচতে পারলে একটু বেশি; বাঁচব কেন কম?

সদ্যপ্রয়াত স্ত্রী-র উদ্দেশ্যে অমিত লিখলেন
(২৯.৩.২১)

ঈশিতাকে

শূন্যতাকে করে পুঁজি,
সবার মাঝে তোকেই খুঁজি,
হচ্ছে তোকে নতুন করে চেনা।
একলা হলে কষ্ট বড়,
দুঃখগুলো হবেই দড়,
চোখের জলে শুধছি আমার দেনা!

স্ত্রীর কঠিন লড়াইয়ের ভেতর লেখার তাগাদা দেওয়া কথা ভাবিনি। সিরিজের তৃতীয় লেখাটা নিজে থেকেই পাঠালেন। ফোন করতেই বললেন, এ তো আমার অক্সিজেন। এত যার গুণ

তা নিয়ে কোনো বাগাড়ম্বর ছিল না। চুপচাপ নিজের কাজ করে যেতেন। অমিত-এর কিছু শারীরিক সমস্যা ছিল। ভবানীপুরে ডাক্তারখানায় একদিন দেখা। সঙ্গে সদ্য মা-হারা মেয়ে। অমিত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আমরা কথা বলছি পাশে বসে মেয়ে আপন মনে কি সব লিখে চলেছে। অমিতকে জিগ্যেস করলাম, সামনে পরীক্ষা না কি? অমিত বললেন, না, না, সেরকম কিছু নয়, আমি ডাক্তারবাবুকে দেখাবার সময় কিছু বলতে যাতে ভুলে না যাই, তাই ও লিখে রাখছে। আত্মমগ্ন অমিত চৌধুরীর সঙ্গে সেদিনই শেষ দেখা। ব্যক্তিগত ক্ষতি ও পত্রিকার ক্ষতি, অমিত চৌধুরীর প্রয়াণে দুটোই হল। তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

উমা

হিতৈষী সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী চলে গেলেন (১৯৬১-২০২১)

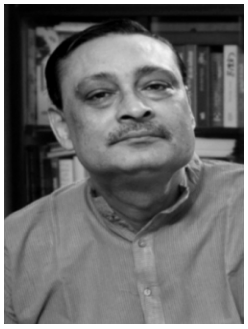

কঠিন রোগের সঙ্গে অসম লড়াইটা ২৬জুন ২০২১-এ থেমে গেল। কলকাতার বি. আর. সিং হাসপাতালে প্রয়াত হলেন উৎস মানুষের খুব কাছের মানুষ সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী। আপাদমস্তক বিজ্ঞানমনস্ক নিপাট ভদ্রলোক সীতাংশুবাবু গত জানুয়ারিতে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন। বছর দেড়েক আগে জটিল 'মায়ালো ডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোম' রোগে আক্রান্ত হন। মানবদেহে রক্তের এই বিরল ও জটিল অসুখ সাধারণত কয়েক লক্ষ মানুষের মধ্যে একজনেরই হয়ে থাকে। সীতাংশুবাবু প্রেসক্রিপশন হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে আমাদের নিয়মিত লেখক এক ডাক্তারবাবুর মতামত জেনে নিয়েছিলেন। ভেঙে পড়েননি। প্রবল অসুস্থ শরীরের কষ্ট উপেক্ষা করেও প্রয়াণের কয়েকদিন আগেও লেখালেখি, পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। শ্রীরামপুর থেকে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য আসতেন। ফেরার সময় কলেজ স্ট্রিটে বই-পাড়ায় একবার ঢুঁ মারবেনই। তাছাড়া কোথায় তালতলার কোন বাড়িতে কাজী নজরুল ইসলাম কিছুদিন থেকেছিলেন, মুরারিপুকুরে বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষদের বাড়ি খুঁজে বের করে তার ছবি পাঠাতেন। অদম্য কৌতূহলী মানুষ, যা বিশ্বাস করতেন তা নিয়ে বলতে দ্বিধা করতেন না। বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সভাসমিতিতে তাঁর উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। শুধু তাই নয়, সেইসব অনুষ্ঠানের রিপোর্ট অত্যন্ত দক্ষতা ও যত্নের সাথে পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। ওঁর বইয়ের সংগ্রহ ঈর্ষণীয়, বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় উল্লেখ করতেন বিষয়ভিত্তিক বইয়ের কথা।

রক্তদাতা হিসেবেই যাঁকে চিনতাম তাঁকেও ৪৫ কি তারও বেশি বার রক্ত নিতে হচ্ছিল। ওঁর বাবা মারা যান গত ৯ নভেম্বর ২০২০। বাবার অন্তিম ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে সীতাংশুবাবু শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান করেন নি। নিজেও এসব মানতেন না। সীতাংশুবাবুর দুটি চোখ দান করা হয়। আর জি কর মেডিকেল কলেজে ওঁর মরদেহের রোগ নির্ণায়ক ময়নাতদন্ত করা হয়। কোভিড ১৯-এ মারা যাননি এমন মরদেহের রোগ নির্ণায়ক ময়না তদন্ত প্রথম সীতাংশুবাবুরই হল। ওঁর পরিবারের অনেকেই মরণোত্তর দেহদান ও চক্ষুদান করে গেছেন। সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী ঘরে বাইরে অনেককেই মরণোত্তর দেহদান ও অঙ্গদানের গুরুত্ব বোঝাতে পেরেছিলেন। বাইরের থেকে ঘরের মানুষদের বোঝানো বেশ কঠিন কাজ। যা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন।

গণদর্পণ, বেলুড় শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীরামপুর আই ব্যাঙ্ক ওঁর এলাকার সংস্থা। মৃত মানুষের কর্নিয়া সংগ্রহে রাজ্যের ভেতর সংস্থাটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সীতাংশুবাবুর সাংগঠনিক দক্ষতার কথা অনেকেই জানেন। রাত-বিরেতে কেউ মারা গেছেন — পরিবার থেকে প্রয়াত মানুষটির চক্ষুদান করতে চাইলে সীতাশুবাবুকে জানালে উনিই সব ব্যবস্থা করে দিতেন। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই মরণোত্তর দেহদান ও অঙ্গদান নিয়ে উনি কতটা কমিটেড ছিলেন তা বোঝা যাবে। কোনও এক ছট পুজোর দিন জি টি রোডে এক যুবক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। খবর পেয়ে সীতাংশুবাবু সঙ্গীদের নিয়ে সোজা শ্মশানে গিয়ে মৃত যুবকের পরিবারকে বুঝিয়ে কর্ণিয়া সংগ্রহ করেন। ঘটনা হল পরিবারের কেউই দেহদান ও অঙ্গদান নিয়ে মোটেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এরকম আরো কিছু ঘটনা ওঁর কাছেই শোনা। শ্মশানে গিয়ে প্রচার চালানো, লিফলেট বিলি করা সেসব তো ছিলই। মোহনবাগান-এর কট্টর সমর্থক সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী ক্লাবের ঐতিহ্য নিয়ে বেশ গর্বিত ছিলেন।

২০০৬, উৎস মানুষ সাংগঠনিক সমস্যায় পড়ে। তখন দ্বিমাসিক পত্রিকা বের করাটাই ছিল মস্ত চ্যালেঞ্জ। সীতাংশুবাবুর মতো আরো কয়েকজন পত্রিকা বাঁচাতে পাশে দাঁড়ান। উত্তর কলকাতার শ্রীমানি মার্কেটের কাছে যেখানে ঘরোয় সভা হত সীতাংশুবাবু ঠিক সময় করে চলে আসতেন। গোবরডাঙ্গা গবেষণা কেন্দ্রের লাইব্রেরিতে গিয়ে তাদের কাছে উৎস মানুষ-এর কোন কোন সংখ্যা নেই তা লিখে পাঠিয়ে দিতেন, কোন কাগজে উৎস মানুষ নিয়ে দু-চার লাইন লিখেছে চোখে পড়লেই ফোনে জানাতেন। কোনও বাগাড়ম্বর ছিল না, নিরহংকারী সীতাংশুকুমার ভাদুড়ীকে নিয়ে অনেক স্মৃতি। ওঁর অকালে এভাবে চলে যাওয়াটা মেনে নিতে কষ্ট হয়। আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই প্রয়াত এই অসাধারণ মানুষটিকে। — **বরুণ ভট্টাচার্য**

উমা

স্বচিকিৎসা — পর্ব ৩

আন্ত্রিক রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

গৌতম মিস্ত্রি

আমার একমাত্র দিদি তার প্রথম জন্মদিনের আগেই আন্ত্রিক রোগে মারা যায়। তখনও আমি জন্মাইনি। এখন যদিও আমার জন্মস্থান শকুন্তলা পার্ক বেশ সম্ভ্রান্ত এলাকা, বিত্তবানরা সেখানে বাস করেন। কিন্তু আমার দিদি আজ থেকে ৬৫ বৎসর আগে যখন শকুন্তলা পার্কের একাধিক রিফিউজি কলোনির একটা কলোনির (পদ্মপুকুর কলোনি) টালির চালের ও মাটির মেঝের কুঁড়ে ঘরে আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হল, তখন সেখানে এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তার মাঝেমধ্যে সবরকমের রুগীর চিকিৎসা করতেন। আমার বাবা অনেক কষ্টে তাঁকে আমার দিদির চিকিৎসার জন্য বাড়িতে নিয়ে এলেন। হোমিওপ্যাথির ওষুধের ফোঁটা নীচের কাগজে রাখা চিনির গোলার মধ্যে না পড়ে বাইরে পড়ল। সেটা কেবল লক্ষ্য করলেন আমার নাবালিকা মা। নিজের মেয়ের মৃতপ্রায় দশায়ও তাঁর পক্ষে সেই অবিচার উল্লেখ করা অসম্ভব হল। হোমিওপ্যাথির গুলিতে ওষুধের ফোঁটা পড়লেও ইতিহাস পাল্টাত না। আসলে আন্ত্রিক রোগে ওষুধের কোনো ভূমিকাই নেই। এইটুকু গাওনা গেয়ে এবার মূল বিষয়ে যাই।

আন্ত্রিক রোগ (গ্যাস্ট্রোএন্টেরোরাইটিস) অন্ত্রের রোগ ? পৌষ্টিক তন্ত্রের পাকস্থলীর নীচে খাদ্য-পানীয়ের পুষ্টি-রূপ শরীরে শোষিত হবার জন্য যে দুটো অংশ জারিত খাদ্য-পানীয় অপেক্ষায় থাকে সেই দুটো অংশ হল ছোট আর বড় দুই অন্ত্র— যথাক্রমে ক্ষুদ্রান্ত্র আর বৃহদান্ত্র। কালেক্রমে এই দুই অন্ত্রের ভেতরের দেওয়াল ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া অথবা খাদ্য-পানীয়ের সাথে মিশ্রিত নিছক বিষতুল্য রাসায়নিক (টক্সিন)-এর প্রভাবে প্রদাহের (ইনফ্লামেশন)-এর কবলে পড়ে। প্রদাহের কারণে অন্ত্রের খাদ্য-পানীয় শোষণের প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন কেবল ভক্ষণ করা খাদ্য-পানীয় অশোষিত অবস্থায় মল হিসাবে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। কেবল তাই-ই নয়, রুগ্ন অন্ত্রের দেওয়ালের রক্তনালী থেকে আগের থেকে আত্মস্থ করা জল আর প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ মলের সাথে অন্ত্র থেকে বেরিয়ে যায়। আন্ত্রিক রোগের কারণে শরীর থেকে প্রচুর জল আর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ অর্থাৎ নুন বেরিয়ে যায়। অন্ত্রের এই রোগসমূহের মধ্যে ভাইরাসের সংক্রমণের আন্ত্রিক রোগই সংখ্যাগুরু আর আন্ত্রিক রোগ নামে কুখ্যাত। দিনে ৩ অথবা তার বেশি বার অথবা ২০০ গ্রামের বেশি পাতলা পায়খানা (জানি কেউ পায়খানা ওজন করেন না, করবেনও না, তবুও আন্দাজ দেবার জন্য জন্য উল্লেখ করা) হলে তাকে আন্ত্রিক রোগ বলে নির্ণয় করা যেতে পারে। এর সাথে বমি, বমির ভাব, জ্বর এবং পেট ব্যথা থাকতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়েন।

আন্ত্রিক রোগ কেন হয় ? এটা একটা সংক্রামক রোগ। আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মল ও বমির সাথে রোগের জীবাণু প্রধানত নোরো, রোটা নামের 'আর এন এ' অর্থাৎ (রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) ভাইরাস ত্যাগ করে। এই ভাইরাস কোনক্রমে পানীয় জলকে দুষিত করলে ক্রমে সুস্থ মানুষের পেটে এই ভাইরাস প্রবেশ করে ও তাকেও আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত করতে পারে। সুস্থ মানুষের শরীরে আন্ত্রিক রোগের ভাইরাস প্রবেশ করলে রোগলক্ষণ প্রকাশিত হতে ১২ ঘণ্টা থেকে ৫ দিন সময় লাগতে পারে। ভাইরাস (পূর্ণ জীব নয়, জীবের কোষের বিশেষ সক্রিয় রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড নামের প্রোটিন) ছাড়াও অল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে ব্যাক্টিরিয়া (পূর্ণ জীব) আন্ত্রিক রোগের কারণ হতে পারে। ভাইরাসের সংক্রমণে আন্ত্রিক রোগ ২ থেকে ৫ দিন স্থায়ী হলেও ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণে আন্ত্রিক রোগ সাধারণত এক সপ্তাহের চেয়ে বেশিদিন ভোগায়। ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণে আন্ত্রিক রোগের আর এক বৈশিষ্ট্য হল, এই ক্ষেত্রে মলের সাথে রক্তক্ষরণ হতে পারে। পরিশোধিত পানীয় জল গ্রহণ আর সঠিক শৌচালয়ের ব্যবহার আন্ত্রিক রোগের নিবারণে সফল।

আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মূল্যায়ন— পেটে ব্যথা আছে কিনা সেটা পেটে হাত দিয়ে বুঝতে হবে, জ্বর আছে কিনা মেপে দেখতে হবে এবং সর্বোপরি বমি আর বারবার পাতলা মল ত্যাগের ফলে শরীরে জলের পরিমাণ কমে যাচ্ছে কিনা সেটা বুঝতে হবে। আন্ত্রিক রোগে মানুষ কেবল শরীরে জলের পরিমাণ কমে যাওয়ার জন্যই (ডিহাইড্রেশন) প্রাণের সংকট উপস্থিত হয়। রোগীর শরীরে ডিহাইড্রেশন রোধ করা, অর্থাৎ পর্যাপ্ত জল ও লবণের মাত্রা রক্ষা করাই আন্ত্রিক রোগের

চিকিৎসার একমাত্র ও সফল উপায়। এটা করার জন্য চিকিৎসক-হাসপাতালের চেয়েও অতি সাধারণ মানুষের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বেশি কার্যকরী।

কোন আন্ত্রিক রোগীর হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার— ঘরোয়া টোটকা চিকিৎসার সাথে মনে রাখতে হবে রোগীর প্রাণ রক্ষার জন্য রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের পরিষেবার জন্য। জেনে নেওয়া যাক কাদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

১) আন্ত্রিক রোগের কারণে যাঁদের শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে গেছে, পর্যাপ্ত প্রস্রাব হচ্ছে না, চামড়া শুকিয়ে কুঁচকে গেছে, রক্তচাপ কমে গেছে, জিভ ও চোখ স্বাভাবিক অবস্থার মতো সিক্ত নেই। ২) পরীক্ষায় পাওয়া রক্তে অস্বাভাবিক সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ইউরিয়া, ক্রিয়াটিনিন। ৩) মলের সাথে রক্তক্ষরণ। ৪) চোখে পড়ার মতো ওজন কমে যাওয়া। ৫) অসহনীয় পেট ব্যথা। ৬) বেশ কিছুদিন ধরে রোগী ভুগছেন, অবস্থার কোনো উন্নতি হচ্ছে না। ৭) বয়স্ক রোগী (৬০-৬৫ বয়সের বেশি বয়স)। ৮) একই সাথে সুগারের রোগ অথবা তেমন কোনো ক্রনিক ও অনিরাময়যোগ্য রোগে ভুগছেন। ৯) রোগিনী অন্তঃসত্ত্বা।

আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসা— আন্ত্রিক রোগের ভাইরাসকে নিশ্চিতরূপে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নির্মূল করে। অর্থাৎ আন্ত্রিক রোগ নিজের থেকেই সেরে যায়। রোগের তীব্রতা ভেদে দুই থেকে সাত দিন কেবল সহায়ক চিকিৎসা (সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট) করতে হয়। ঘন ঘন পাতলা পায়খানা এবং বমির জন্য শরীর থেকে প্রচুর জল ও খনিজ পদার্থ হিসাবে নুন বেরিয়ে যায়। আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসা হল শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জল ও নুন-এর অভাব পূরণ করা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অল্প নুন ও চিনি মেশানো পানীয় জল খাওয়ানোই যথেষ্ট। স্বাভাবিক খাবার অবশ্যই খাওয়াতে হবে। অর্থাৎ রোগী সুস্থ অবস্থায় যে খাবার খেতে অভ্যস্ত ঠিক সেই খাবারই আন্ত্রিক রোগগ্রস্ত অবস্থায় খেতে হবে। অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে বমির জন্য মুখে খাওয়া যথেষ্ট হয় না। তখন শিরায় স্যালাইন (সোডিয়াম ক্লোরাইড ও গ্লুকোজ মিশ্রিত জীবাণু-মুক্ত জল) দিতে হয়। ওষুধ হিসাবে জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল ও বমি বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ওষুধ কখনও কখনও ব্যবহার করতে হয়।

আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত জল জোগানো হচ্ছে কিনা সেটা বোঝার নানা উপায় আছে। শরীরে জলের অভাব হলে প্রস্রাব কমে যায়।একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক ন্যূনতম দেড় লিটার প্রস্রাব করেন। আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দৈনিক প্রস্রাবের পরিমাণ মেপে সেটা লিপিবদ্ধ করা উচিত। শরীরে জলের অভাব হলে জিভ শুকনো হয়ে যায়, চামড়াও কুঁচকে যায়। এই লক্ষণগুলো নজরে রাখতে হবে।

আন্ত্রিক রোগের প্রধান ওষুধ হল অল্প নুন ও চিনি মেসানো পানীয় জল, যেটাকে ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন বা সংক্ষেপে ও আর এস বলে। বাণিজ্যিকভাবে গ্লুকোজ ও নুন মেশানো পাউডার পাওয়া যায়, যেটা পানীয় জলে মিশিয়ে নিয়ে ব্যবহার করার কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। তবে ঘরে তৈরি করা নুন ও চিনি মেশানো পানীয় জল সমানভাবে কার্যকরী। ৩০০ মিলিলিটার আয়তনের এক গ্লাস পানীয় জলে দু-চামচ চিনি ও চা-চামচের চার ভাগের একভাগ নুন মিশিয়ে নিলেই এটা তৈরি হয়ে যাবে। স্বাদ বাড়ানোর জন্য এতে সামান্য পাতিলেবুর রস মেশানো যেতে পারে। রোগীর এই সময় জল পানের ইচ্ছা হয় না। তাই অল্প অল্প করে বারে বারে এই জল পান করাতে হবে।

আন্ত্রিক রোগের আধুনিকতম ও সবচেয়ে সফল কিন্তু সস্তা চিকিৎসা ওরাল রিহাইড্রেশন সলিউশন। এই চিকিৎসার উপায়, যেটা সারা বিশ্বে সফলতার সাথে এখনও ব্যবহৃত হয়— তার আবিষ্কারক পশ্চিমবঙ্গের এক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দিলীপ মহলানবিশ এবং এটা আমাদের এক গর্বের বিষয়। এই বৈজ্ঞানিক অবশ্য ভারতবর্ষে উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে প্রায় ১ কোটি মানুষ সাময়িকভাবে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে বনগাঁর উদ্বাস্তু কলোনিতে এসে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। ঐ সময়ে এমন একাধিক মানুষের বাসের অযোগ্য উদ্বাস্তু শিবিরের মধ্যে একটি এখনকার বনেদি ও সম্ভ্রান্ত অঞ্চল সল্টলেকেও ছিল। বর্তমান নিবন্ধকার কৈশোরে তার উদ্বাস্তু আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে গিয়ে অধুনা সল্টলেকের সেই পলিথিনের দেওয়াল ও ছাদ দেওয়া শিবির দেখেছিল। সেই শিবিরে এক একটি পরিবারের লোকজন কেবল গায়ে গা ঠেকিয়ে শুতে পারে তেমন একটি করে খোপ পেয়েছিলেন। তাঁদের কাছে সেই শরণার্থী শিবিরে বাইরে আর কোনো ফাঁকা পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল না। বনগাঁয়ের শিবির সল্টলেকের শিবিরের চেয়ে আরও অস্বাস্থ্যকর ছিল সেটা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য এইসব শরণার্থী শিবিরে প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম সংখ্যক শৌচালয় ছিল। এর ফলশ্রুতি হিসাবে, উদ্বাস্তু শিবিরগুলি কলেরা সহ অন্যান্য আন্ত্রিক রোগের আদর্শ জায়গা হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে আন্ত্রিক রোগের সফল চিকিৎসা ছিল ইন্ট্রাভেনাস ফ্লুইড বা

স্যালাইনের চিকিৎসা। তার ঝক্কি ও খরচ বিস্তর। এমন সময়ে ত্রাতা হিসাবে উদয় হলেন দিলীপ মহলানবিশ নামে এক মানবদরদী শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। তাঁর বুঝতে কোনো ভুল হল না, স্যালাইনের চিকিৎসা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপায় নেই। সমস্যা মাথায় চেপে বসলে উৎসাহী মরমী মানুষ সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে পান। ডাক্তার দিলীপ মহলানবিশ খুঁজে পেলেন এমন এক চিকিৎসার উপায়, যার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না মিললেও তাঁর চিকিৎসা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর ইউনিসেফ এখনও সারা বিশ্বের জন্য অনুমোদন করেছে। আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত আধুনিক ওরাল রিহাইড্রেশন দ্রবণের আবিষ্কর্তা হিসেবে ডা. দিলীপ মহলামবিশের কোনো পুরস্কার বা স্বীকৃতি না মিললেও তাঁর আবিষ্কার ব্যবহার করে সারা বিশ্ব আজ উপকৃত।

আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসার সফলতা নির্ভর করে পান করা সঠিক গ্লুকোজ আর নুনের সরবতের মাধ্যমে শরীরের জল ও নুনের অভাব পূরণ করার উপায়ে। তার আগে শরীরের জলের পরিমাণ কতটা কমে গেছে সেটা বুঝে নেওয়াটা জরুরি। সুস্থ মানব শরীরের ৬০ শতাংশই জল। মৃদু তীব্রতার আন্ত্রিক রোগে ৩ থেকে ৫ শতাংশ ও মাঝারি তীব্রতায় ৬ থেকে ৯ শতাংশ জল কমে যায়। ১০ বা তার চেয়ে বেশি শতাংশ জল কমে গে সেটা অতি তীব্রতার আন্ত্রিক রোগ— তখন রোগী সচেতনে থাকেন না, তাঁর জল পান করার ক্ষমতাও থাকে না। রোগের তীব্রতার লক্ষণগুলি— ১) রোগী সচেতন নন, ঝিমিয়ে পড়ছেন, স্পষ্ট কথায় কষ্টের কথা জানাতে পারছেন না, ২) প্রস্রাব করেননি অনেকক্ষণ, ৩) জিভ শুকিয়ে গেছে, চামড়া গুটিয়ে গেছে অথবা ৪) রক্তচাপ অনেক কমে গেছে আর নাড়ির গতি তীব্র হয়ে গেছে। এমন হলে রোগী মুখে খাওয়া বা যথেষ্ট জল পান করার জন্য অক্ষম বলে বিবেচ্য হবেন এবং সত্বর হাসপাতালে ভর্তি হয়ে শিরায় স্যালাইন দিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করা যাবে। আমরা স্যালাইনের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের উপরে নির্ভর করব। মৃদু আর মাঝারি তীব্রতার রোগের জন্য চিনি আর নুনের সরবতের চিকিৎসাই সর্বোত্তম। এই সরবতের বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বল্প আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

জলের সাথে নুন অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের শরীরে ঢোকানো আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসার সফলতার একমাত্র উপায়। এই মর্মে জলের সাথে মুনের সরবতের রেসিপির পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে বিস্তর। যেটা কার্যকরী হিসাবে টিকে আছে সেটা হল সম-অসমোলার গ্লুকোজ আর সোডিয়ামের দ্রবণ। যার বৈশিষ্ট্য হল--- ১) অসমোলালিটি হবে ২০০-৩১০ mOsm/L. ২) সম অসমোলালিটির পরিমাণের গ্লুকোজ ও সোডিয়ামের উপস্থিতি, ৩) দ্রবণে গ্লুকোজের মাত্রা প্রতি লিটার জলে ২০ গ্রাম (১১১mEq/L)। ৪) দ্রবণে সোডিয়ামের মাত্রা প্রতি লিটার জলে নুন হিসাবে ৩-৫ গ্রাম, সোডিয়াম হিসাবে ৬০-৯০ mEq/L. ৫) দ্রবণে পটাসিয়ামের মাত্রা প্রতি লিটার জলে ১৫-২৫ mEq/L.

এই প্রসঙ্গে এটা মনে রাখতে হবে বাণিজ্যিক পানীয়ে, এমন ফলের রস, সোডা অথবা এনার্জি পানীয় হিসাবে বহুল প্রচারিত স্পোর্টস ড্রিঙ্কস আন্ত্রিক রোগের চিকিৎসার ততটা সফল নয়। কেন নয় সেটা কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দাবি করে। পান করা নুন মেশানো জল আমাদের পৌষ্টিক নালী থেকে রক্তে শোষিত হবার সবচেয়ে অনুকূল ঘটনার জন্য পানীয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বৈজ্ঞানিকরা নির্ণয় করতে পেরেছেন।

১) পানীয়ে গ্লুকোজ থাকলে সহজে প্রয়োজনীয় জল আর নুন বা সোডিয়াম ক্লোরাইড রক্তে শোষিত হতে পারে, ২) সেই দ্রবণে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি হয়ে গেলে— যেমন ফলের রসে, সোডা আর হেলথ/স্পোর্টস ড্রিংক্সে থাকে— অশোষিত গ্লুকোজ বেশ কিছুটা জল নিয়ে মলের সাথে বেরিয়ে যায়, ৩) আবার নুনের পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে গ্লুকোজের অভাবে শোষিত হতে পারে না। বেশ কিছুটা জল সাথে নিয়ে পাতলা মলের সাথে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। যে পানীয়ে নুনের মাত্রা বেশি, সেটা রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বাড়িয়ে অন্য সমস্যার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ আন্ত্রিক রোগে যে জল পান করতে হবে, তাতে নুন (সোডিয়াম) ও চিনির (গ্লুকোজ) মাত্রা যথাযথ হওয়া প্রয়োজন— অসমোলালিটির এককের হিসাবে সমান পরিমাণের অসমোলালিটির গ্লুকোজ আর সোডিয়াম থাকতে হবে অর্থাৎ অসমোলালিটির এককের হিসাবে ১:১ অনুপাতে গ্লুকোজ আর সোডিয়াম থাকতে হবে।

কখন মুখে নুন-চিনির সরবত পান করানো যাবে না — ১) মাত্রাতিরিক্ত জল ও খনিজ পদার্থ (ইলেক্ট্রোলাইট) শরীর থেকে বেরিয়ে গেলে অনেক সময় রুগী সচেতনে থাকেন না। তখন তিনি নিজ হাতে জলের গ্লাস ধরে পান করতেও পারেন না। তেমন অবস্থা হলে তাঁকে শুইয়ে জল পান করানোর চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে— ঢোক গেলার প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ না থাকার জন্য কিছুটা জল ফুসফুসে ঢুকে গিয়ে (অ্যাস্পিরেশন) সমস্যা বাড়তে পারে। অর্থাৎ রুগী উঠে বসে নিজের হাতে গ্লাস ধরে পানীয় পান করার অবস্থায় থাকা আবশ্যক। ২) রোগের কারণে অনেক সময়ে রক্তে খনিজ পদার্থ, পটাশিয়ামের মাত্রা কমে যায়, তার ফলশ্রুতি হিসাবে অন্ত্রের মধ্যে খাদ্যপানীয়ের চলাচল

সাময়িকভাবে থেমে যায় (প্যারালাইটিক আইলিয়াস), পেট ফেঁপে যায়, এটা অনেক সময় নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ দরকার হয়। সাধারণ মানুষ এটা কী করে সন্দেহ করবেন? রুগীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে তার পায়ুদ্বার দিয়ে বায়ু নির্গত হচ্ছে কি না? যদি না হয়, অথবা সেটা নিশ্চিত করার মতো রুগী যথেষ্ট সচেতন না থাকেন, তার সঙ্গে রোগীর প্রস্রাবের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়, তবে মুখে নয়, শিরায় স্যালাইন দিতে হবে।

বিশেষভাবে প্রস্তুত ও আর ওস-এর বিকল্প হিসাবে অন্য পানীয় কতটা কাজের? আন্ত্রিক রোগের নিরাময়ে চা, ফলের রস, বাণিজ্যিক মিষ্টি পানীয়, হেলথ্ ড্রিঙ্কস্ ইত্যাদির ভূমিকা কী? উত্তর হল, এই পানীয়গুলোতে নুন বা সোডিয়ামের ঘনত্ব অনেক কম আর গ্লুকোজের ঘনত্ব বেশি— ফলে অন্ত্র থেকে রক্তে শোষিত হতে অক্ষম। শোষিত না হওয়া গ্লুকোজ প্রচুর জল নিয়ে মল হিসাবে বেরিয়ে যায়। এই ধরনের পানীয় রুগীকে না দেওয়াই উচিত।

সবশেষে আন্ত্রিক রোগের নিবারণের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আন্ত্রিক রোগ গরীবের রোগ। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া লোকজন কী করে তাঁদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে বাস করেও আন্ত্রিক রোগ নগণ্য মূল্যে প্রতিহত করতে পারেন সেটা আলোচনা করা যেতেই পারে। আন্ত্রিক রোগ একটি জলবাহিত সংক্রমণের রোগ। আন্ত্রিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল আর বমিতে আন্ত্রিক রোগের ভাইরাস নির্গত হয়ে পানীয় জলের মূল আধারকে যাতে দূষিত করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। দ্বিতীয় স্তরের সুরক্ষা হিসাবে তাত্ত্বিক দিক দিয়ে আপামর নাগরিকদের জন্য নিঃশুল্ক নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে স্বীকার করে নিয়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মাঠেঘাটে মলমূত্র ত্যাগ না করে শৌচালয়ের ব্যবহার আবশ্যিক ও তার বন্দোবস্ত করতে হবে রাষ্ট্রের তরফ থেকে। খাবার আগে খাদক আর পরিবেশকের সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে আর খাবার খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত বাসনপত্রও রোগ-জীবাণুমুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, আন্ত্রিক রোগের জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না। অর্থাৎ আন্ত্রিক রোগের প্রতিরোধে সচেতন স্বাস্থ্যকর বিধির বিকল্প কিছু নেই।

উৎস মানুষ-এর জানুয়ারি-মার্চ ২০১৮ সংখ্যায় ডাক্তার দিলীপ মহলানবিশ-এর সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল। আগ্রহী পাঠক পত্রিকার ওয়েবসাইট (www.utsomanush.com) তা দেখতে পারে।

উমা

লাবণ্যপ্রভা ঘোষ ও ভাবিনী মাহাতো: বিস্মৃতির আড়ালে পুরুলিয়ার বাংলা ভাষা আন্দোলনের দুই মুখ

সবর্ণা চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন হয়েছিল পুরুলিয়ার মানভূম অঞ্চলে, যার সূচনা হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। অথচ বাংলা ভাষার জন্য এই আন্দোলন পূর্ববাংলা বা বরাক উপত্যকার আন্দোলনের মতো প্রচারের আলো পায় না। তেমন পরিচিত নাম নন এই আন্দোলনের এক সময়ের প্রধান নেত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষ। তৎকালীন পুরুলিয়ায় যিনি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন 'মানভূম জননী' নামে। তাঁর ঘনিষ্ঠ একজন সহযোগী ছিলেন ভাবিনী মাহাতো। বাংলা ভাষার অধিকারের জন্য এই দুই নারীর অসামান্য অবদান আজ মনে রাখি না আমরা অনেকেই।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পুরুলিয়ার এক ছোট্ট গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামী নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্তের ঘরে লাবণ্যপ্রভার জন্ম। নিবারণচন্দ্র নিজে একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষক হলেও সেই শিক্ষার আলো তখনও ছুঁতে পারে নি বাংলার ঘরের মেয়েদের। পুরুলিয়ার মতো গ্রামগঞ্জে তখন স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারটা সমাজের কাছে নেহাতই হাসির উপকরণ মাত্র। তাই বিদ্যালয় অবধি পৌঁছতে পারেন নি লাবণ্যপ্রভাও। তবে থেমেও থাকেন নি তিনি। নিবারণচন্দ্রের পরিবারে জন্মগ্রহণের সুবাদেই তাঁর বিপ্লবী শিক্ষার, চেতনা-মুক্তির পাঠ শুরু হয়েছিল অনেক ছেলেবেলা থেকেই। সময়ের নিয়মে মাত্র ১১ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায় অতুলচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে, যিনি ছিলেন পুরুলিয়ার তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা।

লাবণ্যপ্রভা দেবীর বাবা ও স্বামী দুজনেই পুরুলিয়ার

উন্নতিকল্পে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং গ্রেপ্তার হন। এরপর লাবণ্যপ্রভা যুক্ত হন কংগ্রেসের সঙ্গে। জোর কদমে চলতে থাকে তাঁর সংগ্রামী কর্মকাণ্ড। নিবারণ দাশগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র ঘোষের মিলিত উদ্যোগে পুরুলিয়ার তেলকল পাড়ায় স্থাপিত হয় 'শিল্পাশ্রম'। এর মাধ্যমে চলতে থাকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বৈপ্লবিক কাজকর্ম। গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র বসু, চিত্তরঞ্জন দাশ সকলেরই আনাগোনা ছিল এই আশ্রমে। লাবণ্যপ্রভা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এই আশ্রমের সঙ্গে। নিবারণচন্দ্র একটি সাপ্তাহিক সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন যার নাম ছিল 'মুক্তি'। নিবারণচন্দ্রের অবর্তমানে লাবণ্যপ্রভার স্বামী অতুলচন্দ্র সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে দায়িত্ব নেন লাবণ্যপ্রভা নিজে। এই পত্রিকাই হয়ে উঠেছিল তাঁদের মুখপত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা বক্তব্য এবং পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই 'মুক্তি' পত্রিকা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

লাবণ্যপ্রভা ঘোষ পুরুলিয়ার প্রথম মহিলা এম এল এ হিসাবে নির্বাচিত হন। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নেন। এছাড়াও ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের গান্ধীজীর লবণ সত্যগ্রহ, ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৫-এর পতাকা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকার অপরাধে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছে বহুবার। কিন্তু তিনি থেমে থাকেন নি।

অনেক রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা এলেও প্রকৃতপক্ষে সে স্বাধীনতা দেশের মানুষজন কতটা পেয়েছিল তা নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ নেই। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলেও পুরুলিয়া অঞ্চলের মানুষের ওপর তখনও চলছিল শাসকের অত্যাচার। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়পর্বে, বিশেষত ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত সমগ্র মানভূম অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বসারের যুদ্ধের পরবর্তীকালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলত কোম্পানি এই এলাকাগুলির উপর বসাতে থাকে তাদের কর। এবং কোম্পানির এই কর সংগ্রহের সুবিধার জন্য তারা ছোটনাগপুর অঞ্চলকে নিজেদের সুবিধামত বেশ কিছু ভাগে ভাগ করে দেয়। এই ভাগ হয়ে যাওয়া অঞ্চলগুলির মধ্যেই ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয় মানভূম অঞ্চলের। বর্তমানে এই মানভূম জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হলেও এর আগে পুরুলিয়া ছিল বিহারের অন্তর্গত। কিন্তু পুরুলিয়ার অধিকাংশ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা। বিহারের অন্তর্গত হওয়ায় তাদের নিজেদের ভাষা বাংলাকে মুছে দিয়ে তাদের ওপর হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলতে থাকে। স্কুল, কলেজ ও সরকারি কাজে হিন্দি ভাষার একাধিপত্য চলতে থাকে। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার জন্যই সেদিন প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল আপামর পুরুলিয়াবাসী। তবে প্রকৃত বিচারে এই আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে অনেক আগেই। ১৯১২ সাল থেকেই মানভূমে এই ধরনের দাবি নিয়ে সোচ্চার হতে শুরু করেছিল সাধারণ মানুষ। ১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে ভাষা ভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি ওঠে। সেই দাবি গৃহীত হলে ১৯৩৫ সালে বিহারে জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতায় আসার পর ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ-এর সভাপতিত্বে গড়ে ওঠে 'মানভূম বিহারি সমিতি'। তৎক্ষণাৎ এর প্রতিবাদে পি আর দাশ-এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে 'মানভূম সমিতি'। কখনোই পুরোপুরি থিতিয়ে যায় নি ভাষার অধিকার নিয়ে মানভূমবাসীর এই বিদ্রোহ।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সেই একই দাবি আবার সোৎসাহে মাথা তুলে দাঁড়ায়। এটি পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন। পুরুলিয়া কোর্টের আইনজীবী শরৎচন্দ্র সেন, রজনীকান্ত সরকার, গুণেন্দ্রনাথ রায় সহ ৩৭ জন বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে জাতীয় কংগ্রেস দল ত্যাগ করে গড়ে তোলেন আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী দল 'লোক সেবক সংঘ'। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করে এই আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের ৩০ এপ্রিল জিতনি গ্রামে 'মানভূম বাংলা ভাষাভাষী'র দাবিতে এই আন্দোলনের পুনরায় প্রাণ সঞ্চার ঘটে। এই ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন লাবণ্যপ্রভা দেবী। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকে তিনবার গ্রেপ্তার হতে হয়। কিন্তু তা তাঁকে দমিয়ে রাখার পরিবর্তে আরও উদ্বুদ্ধ করতে থাকে প্রতিবার। ১৯৫৬ সালের ২০ এপ্রিল পাকবিড়া গ্রাম থেকে কলকাতা পর্যন্ত হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এক পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন তিনি। এই পদযাত্রা শেষ হয় ৭ মে কলকাতা শহরে পৌঁছানোর পর। তারপরেই আসে পুরুলিয়ার বাংলা ভাষাপ্রেমী জনগণের বহু আকাঙ্ক্ষিত ফলাফল। ১৯৫৬ সালের ১৭ আগস্ট লোকসভায় বাংলা বিহার সীমান্ত বিল' পাস হয় এবং তার কিছুদিন পরেই ২৮ আগস্ট ওই বিল পাস হয় রাজ্যসভা থেকে। সেই বছরই অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর

পশ্চিমবঙ্গের সাথে পুরুলিয়াকে যুক্ত করা হয়। জয় হয় বাংলা ভাষার। ভাষা আন্দোলনে তাঁর এই অবদানের জন্য ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষা শহীদ স্মারক সমিতির পক্ষ থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লাবণ্যপ্রভা দেবীকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। ২০০০ সালের ১১ এপ্রিল ১০৬ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর।

এ কাজে লাবণ্যপ্রভা দেবীর সহযোগী হয়েছিলেন আরও এক ভাষাপ্রেমী নারী। তাঁর নাম ভাবিনী মাহাতো। পুঁথিগত শিক্ষার মাপকাঠিতে অশিক্ষিত বালবিধবা ভাবিনী স্বামীর মৃত্যুর পর সংসারের মায়া কাটিয়ে ভারত মায়ের সংসারের সদস্য হয়ে ওঠেন। আশ্রমে আগত বিশিষ্ট মানুষজনের বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে স্বাদীনতা সংগ্রামের মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করেন। সদস্য হন কংগ্রেসের। পরবর্তীকালে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মানভূমের ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেন তিনি। গান্ধীজীর আদর্শ মেনে শুরু করেন ভাষা সত্যাগ্রহ অর্থাৎ টুসু সত্যাগ্রহ। টুসু গানের মধ্যে দিয়েই নিজেদের ভাষা আন্দোলনকে তুলে ধরেছিলেন ভাবিনী ও তাঁর অনুগামীরা। তাঁদের বাঁধা একটি টুসুগীতির কথাগুলি খুবই আকর্ষণীয়—

শুন বিহারী ভাই/তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাই/তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি/বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।/ভাইকে ভুলে করলি বড়/বাংলা-বিহার বুদ্ধিটাই।।/বাঙালী বিহারী সবাই/এক ভাষাতে আপন ভাই।/বাঙালীকে মারলি তবু/বিষ ছড়ালি হিন্দী চাই।।/বাংলা ভাষার দাবীতে ভাই/কোন ভেদের কথা নাই।/এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে/মাতৃভাষার রাজ্য চাই।। —ভজহরি মাহাতো

শুরু হয় ধরপাকড়। টুসু গান গাওয়ার উপর নেমে আসে নিষেধাজ্ঞা। এই গান গাওয়া আন্দোলনকারীদের উপর আসতে থাকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। কিন্তু মায়ের ভাষার জন্য লড়তে আসা সৈনিকদের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না সরকারের। তারই প্রতিবাদে ১২ জানুয়ারি অতুলচন্দ্র ঘোষ সরকারের রক্তচক্ষুকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টুসু গানকে মানভূমের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য নির্দেশ দেন। মানভূমের প্রতিটি রাস্তা মেতে ওঠে টুসু গানের তালে তালে।

টুসু সত্যাগ্রহ তিনটি পর্যায়ে সংঘটিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৯-১৯ জানুয়ারি সংঘটিত হয় এর প্রথম পর্যায়, ২০-২৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় পর্যায় এবং ২৭ জানুয়ারি-৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ে টুসু সত্যাগ্রহের সময়কাল নির্ধারণ করা হয় শ্রীপঞ্চমী পর্যন্ত।

এরপর হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে নানা পদযাত্রায় সামিল হতে থাকেন ভাবিনী মাহাতো। ১৯৫৪ সালে বিহার সরকার এই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা ঘোষণা করলে লাবণ্যপ্রভা দেবী, ভজহরি মাহাতো, ভাবিনী মাহাতো স্বেচ্ছায় কারাবরণ করেন। এরপরই শুরু হয় কলকাতার উদ্দেশ্যে সেই ঐতিহাসিক পদযাত্রা। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে লাবণ্যপ্রভা দেবীর সঙ্গে ভাবিনী মাহাতোর নামও উঠে আসে শিরোনামে। ২০১৪ সালের ২৪ জুন মানবাজারে ৯৯ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তাঁর।

আমাদের ইতিহাস আজ ভুলে গেছে লাবণ্যপ্রভা ঘোষকে। ভুলে গেছে ভাবিনী মাহাতোর লড়াইকে। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভাষা আন্দোলনের জন্য রাস্তা কেটে দেওয়া লাবণ্যপ্রভা দেবীকে তাঁর শেষ জীবনটা কাটাতে হয় অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে। কয়েক বছর আগেও বেঁচে থাকা ভাবিনী মাহাতোর কথা পরবর্তী প্রজন্মের কেউ জানতে চান না। নিদারুণ অবহেলা নিয়ে মরতে হয় তাঁকে। ইতিহাস বই তাঁদের ভুলে গেলেও বাংলা ভাষার ইতিহাস তাঁদের ছাড়া সম্পূর্ণতা পাবে না কোনওদিন।

তথ্যঋণ: অন্তর্জাল (লেখাটি প্রথম প্রকাশ হয় সিলি পয়েন্ট-এ)

উমা

নোরা অল-ম্যাক্রোশি

বছর সাতাশের নোরা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তিনিই হতে চলেছেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রথম মহাকাশচারী। তেলের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে চাইছে আমিরশাহী। তারা ২০২৪-এর ভেতর চাঁদে রোভারের মতো মহাকাশযান পাঠাতে চায়। প্রায় ৪৩০০ আবেদনকারীর ভেতর থেকে বেছে নেওয়া হয় নোরা ও মহম্মদ আলমুল্লাকে। বিজ্ঞানে দক্ষতা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, শারীরিক, মানসিক ও মেডিক্যাল পরীক্ষার পরে নোরাকে বেছে নেওয়া হয়। তিনি নাসায় প্রশিক্ষণ নেবেন।

আকাশের কথা

দীপঙ্কর দে

আকাশ — নামটা শুলেই আমাদের মনে কেমন যেন অসীম-উন্মুক্ত এক অনুভূতি হয়। 'আকাশ আমায় শিখিয়ে দিল উদার হতে ভাই রে' ... সেইরকমই ব্যাপার আর কি। আকাশ নিয়ে সকলের কল্পনার অন্ত নেই, তাই হয়ত শূন্যকে ঘিরেই পূর্ণ হয়ে উঠেছে সাহিত্য ভাণ্ডারের অনেকাংশ। তবে আজকে আর কল্পনার জগৎ নয়, একটু সত্যিকারের গল্প করা যাক; আকাশের গল্প— আকাশ দেখার গল্প। এখন কেউ হয়ত ভাবছেন, এ কেমন কথা! আকাশ আবার আলাদা করে দেখার কি আছে, রোজই তো দেখছি সবাই। তাহলে বলি, বইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলেই যেমন বই পড়া হয় না, তেমনি আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে তাকে দেখা হয় বটে কিন্তু বোঝা হয় না। তবে উপায় কি? সেই উপায় নিয়েই খানিক বলব আজকে, চেষ্টা করব আকাশের কিছু উজ্জ্বল মণিমাণিক্য চিনে নিতে।

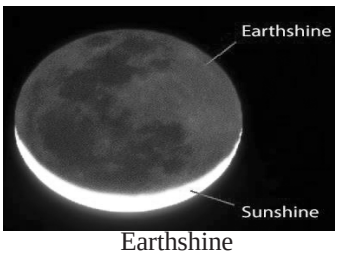

Earthshine

দেখার আগে একটু ভূমিকা দিয়ে নেওয়া যাক। প্রতিদিন আমরা দেখছি সূর্য-চাঁদ-তারা সময়ের সাথে সাথে আকাশের গায়ে পুব থেকে পশ্চিমে দৌড়চ্ছে; এই নড়নচড়নের কারণটা কি? পৃথিবী মহাশূন্যে পাক খাচ্ছে আর তার চারদিক ঘিরে রয়েছে আকাশ, মনে করা যেতে পারে ঠিক যেন পৃথিবীকে কেন্দ্রে রেখে একটা বিরাট ফাঁপা বল। যদি একটা খোলা মাঠে বা ছাদে গিয়ে দাঁড়ানো হয় তবে দেখতে পাব আকাশটা যেন একটা বিশাল ছাতার মতো মাথার ওপর রয়েছে, আর তার বাকি অর্ধেকটা আছে দিগন্তের নীচে, সময়ের সাথে ক্রমশ পূর্ব দিগন্ত থেকে উঠে আসবে সেটা। আসল ঘটনা হল, পৃথিবী নিজের ঘূর্ণন অক্ষের চারপাশে পশ্চিম থেকে পূর্বে পাক খাচ্ছে, আর আমরা হলাম তার সওয়ারি, ফলে মনে হচ্ছে যেন আকাশটাই পুব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। ঠিক যেমন চলন্ত ট্রেনে বসে মনে হয়, আমি স্থির আর বাইরের গাছপালা-ঘরবাড়ি সব উল্টোদিকে ছুটছে। তাহলে বোঝা গেল, আসলে আকাশটা ঘুরছে না, আমরা ঘুরছি।

আকাশের পাড়ায় যাওয়ার আগেই একটা কথা বলে রাখি, অনেকের ধারণা যে আকাশ দেখতে গেলে প্রয়োজন প্রচুর যন্ত্রপাতি। প্রধানত টেলিস্কোপ বা নিদেনপক্ষে একখানা বাইনোকুলার, কিন্তু বিশ্বাস করুন আমাদের সকলের কাছে আকাশ দেখার দু'টো অসম্ভব ভালো যন্ত্র রয়েছে— আমাদের দুটো চোখ। হ্যাঁ সত্যি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না, আকাশ চিনতে গেলে খালি চোখেই আকাশ দেখতে হবে। এবার তবে মহানন্দে আকাশ দেখা শুরু করা যাক। কিন্তু আবার এক সমস্যা। সন্ধ্যেবেলা ছাদে বা মাঠে গিয়ে দেখলেন, কি সর্বনাশ, এত তারা আকাশে! চিনব কি করে? সত্যিই তো, রাতের অন্ধকার আকাশে খালি চোখে আমরা প্রায় হাজার পাঁচেক তারা দেখতে পাই। কেউ অবাক হতে পারেন, কই কলকাতার আকাশে তো কখনো এত তারা দেখা যায় না! এর একমাত্র কারণ আলোক দূষণ। আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ কৃত্রিম আলোর অপরিমিত ব্যবহারে এতটাই 'উজ্জ্বল' করে ফেলেছি যে আকাশের অন্ধকার হার মেনেছে তার কাছে। নিজেদের তৈরি করা সমস্যাই শহরে আকাশ পর্যবেক্ষণের প্রধান অন্তরায়। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে আলোক দূষণকে কোনোরকম দূষণের আওতায় রাখতেই রাজি নন, আর তাতেই বাড়ছে অসচেতনতা। অথচ এই দূষণকে আমরা সহজেই কমাতে পারি, সচেতন হয়ে আলোর নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিত ব্যবহার আবার ফিরিয়ে দিতে পারে তারায় ভরা আকাশ। যাই হোক, এখন কথা হল তারাদের চিনব কি করে? আচ্ছা, আমরা পৃথিবীর ওপর কোনো অচেনা জায়গা খুঁজতে হলে কি করি? মানচিত্র দেখি তাই তো? আকাশের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ব্যবস্থা। কিন্তু সেই মানচিত্র তৈরি হবে কি দিয়ে, আকাশে তো শুধুই তারা, পথ-ঘাট বলে তো কিছুই নেই। এর উপায়ও মানুষ বার করে ফেলেছিল বহুকাল আগেই। তাঁরা করলেন কি, আকাশের বিভিন্ন অংশের উজ্জ্বল তারাগুলোকে কিছু কাল্পনিক রেখাংশ দিয়ে জুড়ে তৈরি করে ফেললেন নানান কাল্পনিক আকৃতি— তার কোনোটা কাঁকড়াবিছের মতো, কোনোটা ভাল্লুকের মতো, কোনোটা বা চেহারা নিল এক বিশাল শিকারির— ব্যস্, তারাগুলোর ঠিকানা ঠিক করে দেওয়া গেল। এইসব কাল্পনিক রেখাচিত্রগুলোকেই আমরা বলি তারামণ্ডল বা

Constellation। খুব ,সম্ভবত ব্যবলনীয়রা প্রথম এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন আকাশ চেনার জন্য। এবার গণ্ডগোল বাধল অন্যদিকে, প্রাচীনকাল থেকেই এক এক দেশ নিজেদের মতন করে এক এক রকম আকাশ চেনার ব্যবস্থা করতে শুরু করল। ফলে একই তারামণ্ডল কোনো দেশে চেহারা নিল সিংহের তো কোনো দেশ তাকে মনে করল এক অতিকায় ড্রাগন, এক দেশ ভাবে তারাগুলো ঠিক যেন হাতার চেহারা নিয়েছে তো অন্যজন বলে হাতগাড়ি। এই কারণে বর্তমানে আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থা (International Astronomical Union বা IAU) মোট ৮৮টি তারামণ্ডলকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর চারপাশে আমাদের দেখতে পাওয়া ফাঁপা বলের মতো আকাশটাকে মোট ৮৮টা ভাগে ভাগ করে ফেলা হয়েছে এবং এক একটা ভাগ হল এক একটা তারামণ্ডল। এখানে বলে রাখা ভালো যে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে কেবলমাত্র আকাশ চিনতে সুবিধে হবে বলে, যাতে বিভিন্ন গ্রহ-তারাগুলো আকাশের গায়ে ঠিক কোথায় রয়েছে সেটা নির্দিষ্ট করে বলা যায়। **ফলে এইসব কাল্পনিক চিত্রগুলো আমাদের জীবনে নানা প্রভাব বিস্তার করে বলে যেসব কথা রটানো হয় সেগুলোও যে যথেষ্টই কাল্পনিক তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু শুধু বেচারা গ্রহ-তারাগুলোর ঘাড়ে দোষ-গুণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া।**

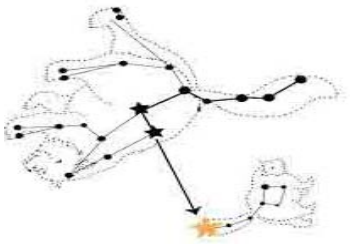

সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে ধ্রুবতারা খুঁজে পাওয়ার পদ্ধতি

আকাশ দেখা সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা হয়ত এতক্ষণে পাওয়া গেল, এবার দেখার পালা। শুরু করা যাক সবচেয়ে সহজ জিনিস দিয়ে— চাঁদ। আকাশের আর কিছু চেনা থাক বা নাই থাক এই বস্তুটি ৮ থেকে ৮০ সকলের পরিচিত। চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের থেকে আসা অলোকরশ্মি তার রূপের কারিগর... মানে আমরা যেমনটি পৃথিবী থেকে দেখি আর কি। প্রতিদিন চাঁদের দৃশ্যমান গোল চাকতিটা কেমন চেহারা পাল্টে ফেলে, আমরা বলি চাঁদের কলা পরিবর্তন। কেন চাঁদের এরকম বদলে যাওয়া? সহজভাবে বলা যায়, চাঁদ যেহেতু পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে, এবং এমনভাবে ঘুরছে যে আমরা পৃথিবী থেকে চাঁদের একটা পিঠই সবসময় দেখতে পাই, ফলে প্রতিদিন চন্দ্রপৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট আলোকিত অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটাই চাঁদের কলা। একটা অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা হয়ে আবার অমাবস্যা হতে সময় লাগে প্রায় ২৯.৫ দিন, একে বলা হয় যুতিমাস (Synodic month)। বলে রাখা ভাল মাসের ধারণা কিন্তু এসেছে চাঁদের এই কলা পরিবর্তন লক্ষ্য করেই, সে আর এক ইতিহাস, এখন থাক সেসব কথা। বরং অন্য একটা মজার কথা বলি। যখন আকাশে চাঁদকে ফালির মতন দেখায়, অর্থাৎ অমাবস্যার তিন-চারদিন আগে থেকে অমাবস্যার তিন-চারদিন পর অবধি। লক্ষ্য করলে দেখবেন উজ্জ্বল অংশটাতো দেখা যাচ্ছেই তার সাথে অন্ধকার অংশটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, উজ্জ্বল অংশটা সূর্যের আলোয় আলোকিত তাই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু যে অংশে সূর্যের কোনো আলো পড়ছে না সেখান থেকে আলো আসছে কি করে? উত্তরে অবাক হতেও পারেন, এর জন্য দায়ী পৃথিবী। ঘটনা হল, পৃথিবীর ওপর প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো অংশে সূর্যের আলো পড়ছে এবং তা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে মহাশূন্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। এই প্রতিফলিত রশ্মির কিছু অংশ চাঁদের গায়ে গিয়েও পড়ছে আর আবার চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে পৃথিবীতে। ফলে আমরা ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশটাকেও দেখি খানিকটা আলোকিত, তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে Earthshine.

এরপর আসি তারাদের কথায়। এখন উত্তর গোলার্ধে গরমকাল চলছে। সন্ধ্যে ৭টার দিকে আকাশের উত্তর দিকে তাকিয়ে একবার মাথা তুলে তাকান, দেখতে পাবেন সেই বইয়ের পাতার জিজ্ঞাসার চিহ্নটা (?) আকাশের গায়ে কেমন শুয়ে আছে— হ্যাঁ, সপ্তর্ষিমণ্ডল। সাতটা উজ্জ্বল তারা যাদের ভারতীয় নাম ক্রতু, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ এবং মরীচি। সপ্তর্ষিমণ্ডল কিন্তু কোনো তারত্রামণ্ডল নয়, এটি একটি তারামণ্ডলের অংশবিশেষ। যে তারামণ্ডলের অংশ এটি তার নাম Ursa Major বা বড় ভাল্লুক। ঐ অংশের তারাগুলো নিয়ে ভাল্লুকের চেহারাটা যদি বোঝা যায় তবে তার পিঠের দিক থেকে লেজ অবধি অংশটা সপ্তর্ষি নামে পরিচিত। এখন উত্তর আকাশ যখন দেখছেন স্বাভাবিকভাবেই ধ্রুবতারার কথা উঠবে, যে তারাটা নাকি আকাশে স্থান পরিবর্তন করে না। শুধুমাত্র এই গুণের জন্য কেউ যদি ভেবে থাকেন ধ্রুবতারা আকাশের অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি তারা এবং উত্তর দিকে তাকালেই সে চোখের সামনে এসে হাজির হবে, তবে তাঁকে একটু হলেও নিরাশ হতে হবে বৈকি। ধ্রুবতারা মোটেই খুব উজ্জ্বল একটা তারা নয়, এমনকি শহরের আলোক-দূষিত

আকাশে একে খুঁজে পাওয়াই ভার। তবে উপায় একটা আছে। সপ্তর্ষি যখন খুঁজে পেলেন এবার ঐ জিজ্ঞাসা চিহ্নর মাথার দুটো তারাকে মনে মনে একটা লাইন দিয়ে জুড়ে ক্রমশ বড় ভাল্লুকের থেকে দূরে যান, প্রশ্ন হবে কতটা যাব? আপনার চোখে ঐ মাথার দুটো তারার মধ্যে যা দূরত্ব তার মোটামুটি পাঁচগুণ। দেখুন একটা তারায় গিয়ে পৌঁছানো যাচ্ছে, এটাই ধ্রুবতারা। কারোর মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, পৃথিবী ঘোরার জন্য সব তারা পুব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে বলে মনে হয় তবে ধ্রুবতারা নয় কেন? ব্যাপারটা হল, পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষটাকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বরাবর যদি কাল্পনিকভাবে বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আকাশের গায়ে অক্ষটা দুটো বিন্দুতে ছেদ করবে, এদের বলা হয় আকাশের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু (North and South Celestial pole)। ধ্রুবতারা আকাশের উত্তর মেরুর খুব কাছে থাকায় আমরা তার নড়নচড়ন খালি চোখে বুঝতে পারি না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যাকে আজ আমরা ধ্রুবতারা বলে দেখছি সেটা কয়েক হাজার বছর পরে আর ধ্রুবতারা থাকবে না। আকাশের উত্তর মেরুর খুব কাছে যাকে আজ আমরা দেখছি সেই তারাটার নাম Polaris, যা Ursa Minor বা ছোট ভাল্লুক তারামণ্ডলের অন্তর্গত। আজ থেকে কয়েক হাজার পরে Polaris আর এই জায়গায় থাকবে না, ফলে আকাশে তার ধ্রুব হয়ে থাকাও আর হবে না। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশে ধ্রুবতারা ধ্রুব নয়, তা পরিবর্তিত হতে থাকে। মিশর দেশে যে সময় গিজার পিরামিড তৈরি হয় তখন এই ধ্রুবতারার জায়গায় ছিল Draco তারামণ্ডলের একটি তারা, যার নাম ছিল থুবান। আর এখন, প্রায় পাঁচ হাজার বছর পরে, সেই জায়গায় রয়েছে Polaris। কিন্তু ধ্রুবতারার মুকুট এরকম তারান্তর হওয়ার কারণ কি? এর জন্যও দায়ী আমাদের বাসভূমি পৃথিবী। পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারপাশে পাক খাওয়াটা আসলে লাট্টুর মতো, ফলে লাট্টু যেমন পাক খাওয়ার সময় মহানন্দে মাথা দুলিয়ে ঘুরতে থাকে পৃথিবীর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। আর সেই কারণেই আকাশের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর স্থান পরিবর্তিত হতে থাকে, মানে আসলে আকাশের মেরুর স্থান পরিবর্তন হচ্ছে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের এই চক্রাকার সরণের জন্য। আর আমরা দেখছি সময়ের সাথে সাথে বুঝি ধ্রুবতারাটাই সরে যাচ্ছে, আবার সেই একই কথা আসলে আমরা সরছি তারাটা নয়। পৃথিবীর অক্ষের এই চক্রাকারে ঘোরাকে বলা হয় অয়ন গতি, আর এক চক্কর দিতে সময় লাগে প্রায় ২৫৮০০ বছর। তাহলে থুবানকে আবার ধ্রুবতারা হিসেবে কেউ দেখতে চাইলে অপেক্ষার আর মাত্র ২০৮০০ বছর।

অয়ন গতির চক্রাকার পথ

এবার উত্তর থেকে একটু পূর্বদিকে ফেরা যাক। জুন মাস ধরেই যদি বলি ধরা যাক রাত্রি ন'টা, পরের মাসগুলোয় সময়টা খানিক এগিয়ে নেওয়া যেতেই পারে। পুবপানে চেয়ে দেখবেন তিনটি বেশ উজ্জ্বল তারা দেখা যাচ্ছে। তারা তিনটিকে পরস্পর যুক্ত করলে বেশ সুন্দর একটি সমকোণী ত্রিভুজ তৈরি হয়, এটি গ্রীষ্মের ত্রিভুজ বা Summer triangle নামে পরিচিত। তারা তিনটের নাম অভিজিৎ (Vega), শ্রবণা (Altair) এবং হংসপুচ্ছ (Deneb), প্রত্যেকে আলাদা আলাদা তারামণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। মজাটা হল, উত্তর গোলার্ধে এখন গরমকাল তাই এই ত্রিভুজকে আমরা সন্ধ্যের আকাশে পূর্বদিকে দেখছি। যদি নিয়মিত লক্ষ্য রাখেন দেখবেন শীতকাল যত এগিয়ে আসবে এই ত্রিভুজটা সন্ধ্যের আকাশে তত পশ্চিমে চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ গরমকালের বিদায় জানান দিতে থাকছে। স্বাভাবিকভাবেই মনে হবে, তবে কি শীতের আগমন জানিয়ে দিতেও আকাশে কোনো ব্যবস্থা আছে নাকি? অবশ্যই আছে, শীতের সময় সন্ধ্যের আকাশে এরকম আরও একটি ত্রিভুজ আমরা দেখতে পাই, তাই নাম হয়েছে শীতের ত্রিভুজ বা Winter Triangle। লুব্ধক (Sirius), সরমা (Procyon) এবং আর্দ্রা (Betelgeuse) এই তিন তারা মিলে তৈরি করেছে এই সুদৃশ্য সমদ্বিবাহু ত্রিভুজটি এবং এই তিনটি তারাও আলাদা আলাদা তারামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। একটা কথা জানিয়ে রাখি, লুব্ধক তারাটা আমাদের রাতের আকাশের উজ্জ্বলতম তারা। তাহলে তারা দিয়ে বেশ ঋতু চিনে নেওয়ার ব্যবস্থাও করা গেল।

শুধু কিছু তারা নয়; বুধ-শুক্র-মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি এই পাঁচটি গ্রহকে সহজেই খালি চোখে দেখা যায়, এবং শহরের আকাশ থেকেও এদের দেখতে কোনো অসুবিধা হয় না। রাতের আকাশে এখন বৃহস্পতি আর শনি গ্রহকে দেখা যাচ্ছে। এই বছর জুন মাসের এই সময় রাত একটার দিকে বা তার খানিক আগে থেকেই পূর্বদিকে দুটি উজ্জ্বল বস্তু চোখে পড়বে, তাদের মধ্যে বেশি উজ্জ্বল বিন্দুটা বৃহস্পতি, অন্যটা শনি। কেউ যদি ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটাতে চান তবে ক্ষতি নেই, গ্রহযুগলের দর্শন পাবেন সূর্যোদয়ের আগে একটু অন্ধকার থাকতে উঠলেই। তবে তখন একটু দক্ষিণ ঘেঁষে তাকাতে হবে, কারণ আপনি বিশ্রাম নিলেও পৃথিবীর বিরাম নেই, সে

পরবর্তী অংশ ১৯ পাতায়